দ্বন্দ্বমধুর

সৈয়দ মুজতবা আলী

ও

রঞ্জন

ত্রিবেণী প্রকাশন

১০; শ্যামাচরণ দে

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীকানাইলাল সরকার
১৭৭।এ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৪

মুদ্রক :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রন :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং

বাঁধাই :
ওরিয়েণ্ট বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১০০ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

দাম ৩'৫০

উৎসর্গ

বাঙলা সাহিত্যকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে, তার অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন উভয় বাঙলার যে-সব পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা বাঙলাকে সুন্দর ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে সত্যবদ্ধ—

তাঁদের উদ্দেশে

এই লেখকদের লেখা

সৈয়দ মুজতবা আলীর

ধূপছায়া

দেশে বিদেশে

পঞ্চতন্ত্র

ময়ূরকণ্ঠী

চাচা কাহিনী

অবিশ্বাস্য

জলে ডাঙায়

রঞ্জনের

শীতে উপেক্ষিতা

অন্যপূর্বা

বিকল্প

বইয়ের বদলে

সংকরী

অসংলগ্ন

ভূমিকা

এই কোয়ালিশনী গ্রন্থখানি দেখে অনেকেই ঈষৎ বিস্ময়বোধ করতে পারেন। তাই জানিয়ে রাখা ভাল যে, নিতান্ত কারও বিস্ময় উৎপাদনের জন্য এই কোয়ালিশন গঠন করা হয়নি। এর অন্যতর, অনিবার্য, একটি কারণ ছিল।

কারণ আর কিছুই নয়, ডঃ আলী এবং রঞ্জন—গল্প করায় এঁদের দুজনেরই উৎসাহ যদিও প্রায় অন্তহীন, গল্প লেখায় এঁদের উৎসাহ অতিপরিমিত। আমাদের ইচ্ছে ছিল, দুজনের পৃথক দুখানি বই আমরা প্রকাশ করব। ইচ্ছে ছিল, প্রতিটি বইয়ে অন্তত দশটি করে গল্প থাকবে। কেননা, তার কমে গ্রাহ্য-আয়তনের বই হয় না। পরে আমরা বুঝতে পেরেছি, এঁদের দিয়ে যদি দশটি করে গল্প লিখিয়ে নিতে হয়, তাতে দশটি বছর কেটে যাবার সম্ভাবনা।

সুতরাং এই কোয়ালিশন। ডঃ আলী এবং রঞ্জনের চরিত্র যে অসেতুসাধ্য, তাঁদের গল্পের চরিত্রও যে তা-ই, তা আমরা জানি। তবু যে আমরা এই সেতুবন্ধনের প্রয়াস পেয়েছি, সে শুধু—পাঠকের জন্যই।

এ-বইয়ের নাম দ্বন্দ্বমধুর না হয়ে দ্বন্দ্ববিধুর হতে পারত। হলে বোধ হয় সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হত। কিন্তু, সকলেই আশা করি স্বীকার করবেন, ও-নামে কোন বই হয় না।

—প্রকাশক

নোনাজল

সেই গোয়ালন্দ-চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরে-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে, বদলায়নি শুধু ডিসপ্যাচ ষ্টীমারের দল। এ-জাহাজে ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কিরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা, আর যে গন্ধটা আর সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারী রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তারই পেটেব ভেতর থেকে যেন তারই কারী রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন ষ্টেশনে পৌঁছন মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা আঙ্গুল দিয়ে চোখে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেবলটা আনব আনব

করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা—'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিত 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা হলেও তাঁর 'স্বামী' বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নূতন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কি করে, আর এত সব কেচ্ছা-কাহিনীই বা জোগাড় করল কোথা থেকে? আমি ত একখানা ছুটীর আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এত বড় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হলো। সিলেট নোয়াখালীর আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই—আমিও যেমন!

জাহাজের মেঝো সারেঙ্গের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি টুপি পরে ডেকের উপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড় নয়নে তাকাচ্ছে ও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি।

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ্গ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বললো, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশী দেখিনি, কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরীবকে মেহেরবানী করেন।'

খুশি হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ী কোথায়? বসো—না তার ফুরসত নেই?'

ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়লো।

আমি বললুম, 'সে কি? একটা টুল নিয়ে এস। এসব আর আজকাল'—কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙ্গও টুল আনলো না। তারপর আলাপ পরিচয় হলো। ছাশের লোক—সুখ দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়লো না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী-দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেরকম পুঁথিপড়া শোনে, সেরকম আগা-গোড়া শুনলো, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

আল্লাতালার উদ্দেশ্যে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায় ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, কিন্তু এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায়? আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশী, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর। খুদাতালাই কার জন্যে কি ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল।'

আমেরিকার কথায় মনে পড়লো। 'চৌতলী পরগণায় বাড়ী, না যেন ঐ দিকেই কোনখানে।'

সারেঙ্গ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছিল, ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।' আমি শুধালুম, 'কি হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।' সারেঙ্গ বললে, 'শুনুন।'

'যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কি জান-মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না, যে সে জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায়নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কি রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন—এই জাহাজেই যার দুদিক খোলা, পদ্মার

জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নীচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সবদিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ, বার, চোদ্দ হাজার টনি ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নমের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।'

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের-কলের নীচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলানো হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।'

'কিম্বা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজি বুলিতে একেই বলে 'এমখ'—

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরিজিতে বলে এমাক্‌ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে।'

সারেঙ্গ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ্গ বললে, 'আমাদের সক্কলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে জলে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখখনো একবারের তরেও কাতর হয়নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে

পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমে ছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায়নি, 'এমখ' হয়নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই কামাবে, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্‌ৎ মানা।'

সারেঙ্গ বললে, 'কি বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহর পৌঁছলাম—'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো।'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখেনি, আধুলির বেশী কামায়নি, তার হাতে পনেরো টাকা! সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।'

'আমরা পেট ভরে যা-খুসি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সব্জী। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও-জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।'

'তারপর কুলম থেকে আদম বন্দর।'

আমার আর ইংরিজি 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দুদিকে ধূ ধূ মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল।'

বুঝলুম 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্সই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সব্জী খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খবরটি রাখে।

'পুর্স্ই থেকে মার্স্ই, মার্স্ই থেকে হামবুর—হামবুর জর্মনির মূলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটি উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কি ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজির বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ্গ বললো, 'হামবুর্গে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পারি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম ন্যুউক বন্দরে—মিরকিন মুলুকে।'

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকেই ন্যুউক বন্দরে নামতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে। আর হবেই বা না কেন? মার্কিন মুলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভূষাও সেখানে মাসে পাঁচ সাত শ টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশ-কালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশী কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণ ভরে টাকা কামাবে! তাতে নাকি মার্কিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।'

'ন্যুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভাণ করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলী করেনি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।'

'মুউক পৌঁছবার দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসম কিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কি কৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।'

'বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কি রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরী করেছিল। কলকাতার চোরা বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রংয়ের স্যুট, সার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।'

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি জোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামলো জাহাজের উল্টো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার স্যুট, জুতো মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে সে শিষ দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটি ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, সেখানে সে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে মুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটিরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার স্যুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে মুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিলো হাওয়া খেতে।'

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ খোঁজ রব উঠলো পরের দিন দুপুর বেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয়, সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম

না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখীকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক সহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন পুলিশের গোঁসাই ?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ্গ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ্গ বললে, 'তারপর হুজুর, আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসত হয়ে ওঠেনি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষের ক'বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ী নাকি আমার জন্য কাঁদতো। তা হুজুর দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বাড়ীর দুফোঁটা নোনা জল তার আর কি করতে পারে বলুন।'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙ্গের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ্গ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুৎ পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফশোষ করিনি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে ?'

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা, ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী। বুকে

জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপন ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।'

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশী তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার কোন প্যারে সাড়া দিল না বলে। গাঙ্গের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, 'তোর দেশে ফেরার খবর ত আমি পাইনি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিঁকল না?'

'কোন কথা কয় না। ফকীর-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায়নি।'

'বুঝলুম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ঐ খেতে সে বড়ো ভালবাসতো—কিচ্ছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানী দিয়ে তাকে বাঁচান যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কি করে?'

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না। আমার, হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের যখন নামতে দেয়নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।'

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।'

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কি ঘটেছে।'

সারেঙ্গ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তার সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কি করে সায়েব? এখনো

মনে আছে, কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিন্ধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব কিছু সেরে দিয়েছিল।'

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানিনে এক সঙ্গে কখনো চোখে দেখিনি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানিনে, আমিও দেখিনি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানী দিতে হয়।'

'প্রথম পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ী ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ীর পাশের পতিত জমি কেনার জন্য। তারপর আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুণকাম করা, দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ীর পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙীঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।'

'সাত বচ্ছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে, অসুরের মত খেটে, ডু শিফট আড়াই শিফটে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।'

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ী বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য মিরকিন মুলুকের মানুষ যে রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়ীতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।'

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরী শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। ন্যুইক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমীও বিনা তকলীফে। তার ওপর সমরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরী করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে, শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা ভোর হতে না হতেই বাড়ী পৌঁছে যাবে।'

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।'

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধান ক্ষেতের মাঝখানে।'

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নক্সাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরি ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশী।'

'কত দূর-দরাজ থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।'

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙীঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'সে কি কথা!',

সারেঙ্গ যেন আমার প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর,

আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ী ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ী-ঘরদোর গাঁয়ের অন্যদিকে বানিয়েছে? কই, তাহলে ত নিশ্চয়ই সে কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গায়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।'

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চাননি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কি।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বলো কি সারেঙ্গ! এ রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বলো দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ্গ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায়নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়ী-ঘরদোর বাঁধতে, জমি খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে মিরকিন মুলুকে গেরস্থালী পেতেছে, এদেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা, তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ী হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ। কি পাষণ্ড। তারপর?'

সারেঙ্গ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকেনি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলেনি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরেনি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।'

'কলকাতার গাড়ী সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুব্বীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন ষ্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে সেদিন গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর তু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ী চল, ফের মিরকিন যাবি ত যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, তুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন মুখ নিয়ে ভায়ের কাছে এল সারেঙ্গ?'

সারেঙ্গ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব, সমীরুদ্দী কি করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিচ্ছু না, শুধু বললে, সে বাড়ী ফিরে যাবে না।'

'তারপরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে ত বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ্গ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী আমাকে সব কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, 'ভিখিরি স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার তুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই তুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়?'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, স্বপ্ন হত তবে এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙ্গের বাদ বাকী কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ্গ বললে, 'চোদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।'

'কিন্তু ঐ যে ইনসাফ বললেন না হুজুর, তার পাত্তা দেবে কে?'

'সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায়নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায়?

নোনামিঠা

ব্যারোমিটার দেখে, কাগজ-পত্র ঘেঁটে জানা যায়, লাল-দরিয়া এমন কিছু গরম জায়গা নয়। জেকোবাদ পেশওয়ার দূরে থাক, যারা পাটনা-গয়ার গরমটা ভোগ করেছেন তাঁরা আবহাওয়া দপ্তরে তৈরি লাল-দরিয়ার জন্ম-কুণ্ডলী দেখে বিচলিত তো হবেন-ই না, বরঞ্চ ঈষৎ মৃদু হাস্যও করবেন। আর উন্নাসিক পর্যটক হলে হয়ত প্রশ্ন করেই বসবেন, 'হালকা আলস্টারটার দরকার হবে না তো!'

অথচ প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে, লাল-দরিয়া আমাকে যেন পার্ক সার্কাসের হোটেলে খোলা আগুনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক-কাবাব ঝলসাচ্ছে। ভুল বললুম; মনে হয়েছে, যেন হাঁড়িতে ফেলে, ঢাকনা লেই দিয়ে সেঁটে আমাকে 'দম-পুখতের' রান্না বা 'পুটপক্ক' করেছে। ফুটবলীদের যে রকম 'বগি' টীম হয়, লাল-দরিয়া আমার 'বগি-সী'।

সমস্ত দিনটা কাটাই জাহাজের বৈঠকখানায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর বরফভর্তি গেলাসটা কপালে ঘাড়ে নাকে ঘসে ঘসে, আর রাতের তিনটে যামই কাটাই রকে অর্থাৎ ডেকে তারা গুণে গুণে। আমার বিশ্বাস ভগবান লাল-দরিয়া গড়েছেন চতুর্থ ভূতকে বাদ দিয়ে। ওর সমুদ্রে যদি কখনো হাওয়া বয় তবে নিশ্চয়ই কিম্-ভূতই বলতে হবে।

তাই সে রাত্রে ব্যাপারটা আমার কিম্ভুত বলেই মনে হল।

ডেকে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। এমন সময় কানে এল, সেই লাল-দরিয়ায়, দেশ থেকে বহুদূরের সেই সাত

সমুদ্রের এক সমুদ্রে—সিলেটের বাঙাল ভাষা। স্বপ্নই হবে। জানতুম, সে জাহাজে আমি ছাড়া আর কোনো সিলেটি ছিল না। এ রকম মরমিয়া সুরে মাঝ রাতে, কে কাকে 'ভাই, হি কথা যদি তলচস'—বলতে যায়? খেয়ালী-পোলাও চাখতে, আকাশকুসুম শুঁকতে, স্বপ্নের গান শুনতে কোনো খরচা নেই; তাই ভাবলুম চোখ বন্ধ করে স্বপ্নটা আরো কিছুক্ষণ ধরে দেখি।

কিন্তু ঐ তো স্বপ্নের একটিমাত্র দোষ। ঠিক যখন মনে হবে, বেশ জমে আসছে, ঠিক তখনই ঘুমটি যাবে ভেঙে। এ-স্থলেও সে আইনের ব্যত্যয় হল না। চোখ খুলে দেখি, সামনে—আমার দিকে পিছন ফিরে দুজন খালাসী চাপা গলায় কথা বলছে।

বেচারীরা! রাত বারোটার পর এদের অনুমতি আছে ডেকে আসবার। তাও দল বেঁধে নয়। বাকি দিনের অসহ্য গরম তাদের কাটাতে হয় জাহাজের পেটের ভিতরে।

সিলেট নোয়াখালির লোক যে পৃথিবীর সর্বত্রই জাহাজে খালাসীর কাজ করে সে কথা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, তারা কাজ করে মাল জাহাজেই; এই ফরাসী যাত্রী-জাহাজে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, তাও আবার নোয়াখালি চাটগাঁয়ের নয়, একদম খাঁটি আমার আপন দেশ সিলেটের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা স্বপ্নেই বেশী, বাস্তবে কম।

এরা কথা বলছিল খুবই কম। যেটুকু শুনতে পেলুম, তার থেকে কিন্তু এ-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল, এদের একজন এই প্রথম জাহাজের 'কামে' ঢুকেছে এবং দেশের ঘর বাড়ীর জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গী পুরনো লোক; নতুন বউকে যে রকম বাপের বাড়ির দাসী সান্ত্বনা দেয় এর কথার ধরণ অনেকটা সেই রকমের।

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। শেষটায় যখন দেখলুম ওরা উঠি উঠি করছে তখন আমি কোনো প্রকারের ভূমিকা না দিয়েই

হঠাৎ অতি খাঁটি সিলেটিতে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বাড়ি সিলেটের কোন গ্রামে।'

সিলেটের খালাসীরা দুনিয়ার তাবৎ দরিয়ায় মাছের মত কিলবিল করে এ সত্য সবাই জানে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বড় সত্য —সিলেটের ভদ্রসন্তান পারতপক্ষে কখনো বিদেশ যায় না। তাই লাল-দরিয়ার মাঝখানে সিলেটি শুনে আবার মনে হয়েছিল ওটা স্বপ্ন, —সেইখানে সিলেটি ভদ্রসন্তান দেখে ওদের মনে হল, আজ মহাপ্রলয় (কিয়ামতের দিন) উপস্থিত! শাস্ত্রে আছে, ঐ দিনই আমাদের সক্কলের দেখা হবে এক-ই জায়গায়। ভূত দেখলেও মানুষ অতখানি লাফ দেয় না। দু'জন যেভাবে এক-ই তালে-লয়ে লাফ দিল তা দেখে মনে হ'ল ওরা যেন ঐ কর্মটি বহুদিন ধরে মহড়া দিয়ে আসছে!

উভয় পক্ষ কথঞ্চিৎ শান্ত হওয়ার পর আমি সিগারেট কেস খুলে ওদের সামনে ধরলুম। দুজনেই একসঙ্গে কানে হাত দিয়ে জিভ কাটল। আমাকে তারা চেনে না বটে—আমি দেশ ছেড়েছি ছেলেবেলায় তবে আমার কথা তারা শুনেছে, এবং আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দার পায়ের ধুলো তারা বিস্তর নিয়েছে, খুদাতালার বেহদ্ মেহেরবাণী, আজ তারা আমার দর্শন পেল, আমার সামনে ওসব— তওবা, তওবা ইত্যাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার দেশের চাষারা ইয়োরোপীয় চাষার চেয়ে ঢের বেশী ভদ্র।

খালাসী জীবনের কষ্ট এবং আর পাঁচটা সুখ-দুঃখের কথাও হল। দুঃখের কথাই পনরো আনা তিন পয়সা। বাকি এক পয়সা সুখ— অর্থাৎ মাইনেটা, সেই এক পয়সাই পঁচাত্তর টাকা। ঐ দিয়ে বাড়ি ঘর ছাড়াবে জমি-জমা কিনবে।

শেষটায় শেষ প্রশ্ন শুধালুম, 'আহারাদি?' —রাত তখন ঘনিয়ে এসেছে।

বললে, 'ঐ তো আসল দুঃখ হুজুর। আমি তো তবু পুরানো

লোক। পাউরুটি আমার গলায় গিঁট বাঁধে না। কিন্তু এই ছেলেটার জান পান্তাভাতে পোঁতা। পান্তা ভাত! ভাতেরই নেই খোঁজ, ও চায় পান্তা ভাত! মূলে নেই ঘর, পুব দিয়ে তিন দোর। হুঃ।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা! আমি তো শুনেছি, আর কিছু না হোক তোমাদের ডাল-ভাত প্রচুর খেতে দেয়। জাহাজের কাম করে কেউ তো কখনো রোগা হয়ে দেশে ফেরেনি।'

বললে, 'ঠিকই শুনেছেন সায়েব। কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কি, কোনো কোনো বন্দরে চাল এখন মাগ্‌গি। সারেঙ্গ আমাদের রুটি খাইয়ে চাল জমাচ্ছে ঐ সব বন্দরে লুকিয়ে চাল বিক্রী করবে বলে। সারেঙ্গ দেশের জাতভাই কি না, নাহলে অন্ন মারার কৌশল জানবে কি করে?'

আমি বললুম, 'নালিশ ফরিয়াদ করোনি?'

বললে 'কে বোঝে কার বুলি? এদের ভাষা কি জানি, 'ফ্রিঞ্চি' না কি, সারেঙ্গই একটুখানি বলতে পারে। ইংরিজি হলেও না হয় 'আমাদের মুরুব্বিদের কেউ কেউ ওপরওলাদের জানাতে পারতেন। ঐ তো সারেঙ্গের কল! ধন্যি জাহাজ; ব্যাটারা শুনেছি কোলা ব্যাঙ ধরে ধরে খায়! সেলাম সায়েব, আজ উঠি। দেরী হয়ে গিয়েছে। আপনার কথা শুনে জানটা—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস।'

মাঝরাতের স্বপ্ন আর শেষ রাতের ঘটনা মানুষ নাকি সহজেই ভুলে যায়। আমার আবার চমৎকার স্মৃতিশক্তি—সব কথাই ভুলে যাই। তাই ভাতের কেচ্ছা মনে পড়ল, দুপুরবেলা লঞ্চের সময় রাইস-কারি দেখে।

জাহাজটা ফরাসিস ফরাসিসে ভর্ত্তি। আসলে এটা ইণ্ডো-চীন থেকে ফরাসী সেপাই লস্কর লাদাই করে ফ্রান্স যাবার মুখে পণ্ডিচেরীতে একটা ঢুঁ মেরে যায়। প্যাসেঞ্জার মাত্রই

পল্টনের লোক, আমরা গুটিকয়েক ভারতীয়ই উটকো মাল। খানাটেবিলে আমার পাশে বসতো একটি ছোকরা সু-লিয়োৎনা— অর্থাৎ সাবঅলটার্ণ। আমার নিতান্ত নিজস্ব মৌলিক ফরাসিসে তাকে রাত্রের ঘটনাটি গল্পচ্ছলে নিবেদন করলুম।

শুনে তো সে মহা উত্তেজিত। আমি অবাক। ছুরি কাঁটা টেবিলে রেখে, মিলিটারি গলায় ঝাঁঝ লাগিয়ে বলতে শুরু করলে, এ ভারি অন্যায়, অত্যন্ত অবিচার, ইন্নুই—অন-হার্ড-অব—, ফাঁতাস্তিক—ফেনটাসটিক আরও কত কী!

আমি বললুম, 'রোসো, রোসো। অত গরম হচ্ছ কেন? এ অবিচার তো দুনিয়ার সর্বত্রই হচ্ছে, আকছারই হচ্ছে। এই যে তুমি ইন্দোচীন থেকে ফিরছো, সেখানে কি কোন ড্যানিয়েলগিরি করতে গিয়েছিলে, যো গাঁর্সো (বাছা)!' ওসব কথা থাক, দু'টি খাও।'

ছোকরাটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল বলেই কথাটা বলবার সাহস হয়েছিল। বরঞ্চ ইংরেজকে এ-সব কথা বলবেন, ফরাসিসকে বললে, হাতাহাতি বোতল ফাটাফাটির সম্ভাবনাই বেশী।

চুপ মেরে একটু ভেবে বললে, 'হুঁঃ। কিন্তু এ স্থলে তো দোষী তোমারই জাতভাই ইণ্ডিয়ান সারেঙ্গ!'

আমি বিষম খেয়ে বললুম, 'ঐ য্-যা!'

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ এখনো দেখলুম না যেখানে মানুষ সুযোগ পেলে দুপুর বেলা ঘুমোয় না। তবু যে কেন বাঙালীরা ধারণা যে, সে-ই এ ধনের একমাত্র অধিকারী তা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আপন আপন ডেক চেয়ারে শুয়ে, চোখে ফেটা মেরে আর পাঁচটি ফরাসিসের সঙ্গে কোরাসে ঐ কর্মটি সবেমাত্র সমাধান করেছি, এমন-সময় উর্দি-পরা এক নৌ-অফিসার আমার সামনে এসে অতিশয় সৌজন্য সহকারে অবনতমস্তকে যেন প্রকাশ্যে

আত্মচিন্তা করলেন, 'আমি কি মসিয়ো অমুকের সঙ্গে আলাপ করার আনন্দ লাভ করছি ?'

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, আরো অবনত মস্তকে বললুম ; 'আদপেই না। এ শ্লাঘা সম্পূর্ণ আমার-ই।'

অফিসার বললেন, 'মসিয়ো ল্য কমাদাঁ—জাহাজের কাপ্তান সাহেব—মসিয়োকে—আমাকে—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দাভিবাদন জানিয়ে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যদি মসিয়োর উপস্থিতি পান, তবে উল্লসিত হবেন।'

পাপাত্মা আমি। ভয়ে আঁৎকে উঠলুম। আবার কি অপকর্ম করে ফেলেছি যে, মসিয়ো ল্য কমাদাঁ আমার জন্য হুলিয়া জারী করেছেন। শুকনো মুখে, ঢোক গিলে বললুম, 'সে-ই হবে আমার এ-জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। আমি আপনার পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল।'

মসিয়ো ল্য কমাদাঁ যদিও যাত্রী-জাহাজের কাপ্তান, তবু দেখলুম তাঁর ঠোঁটের উপর ভাসছে আরেকখানি জাহাজ এবং সেটা সর্বপ্রকার বিনয় এবং স্তুতি-স্তোকবাক্যে টৈটম্বুর লাদাই। ভদ্রতার মানওয়ারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে মোদ্দা কথা যা বললেন, তার অর্থ আমার মত বহুভাষী পণ্ডিত ত্রিভুবনে আর হয় না, এমন কি প্যারিসেও হয় না।

এত বড় একটা মারাত্মক ভ্রমাত্মক তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবো করবো করছি, এমন সময় তাঁর কথার তোড় থেকেই বেরিয়ে গেল, তিনি তিন শ' তিরনব্বুই বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম একটি মহাপণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন, যিনি তাঁর খালাসীদের কিচির-মিচিরের একটা অর্থ বের করতে পারেন। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তা'হলে আমার মত আরো বহুলক্ষ পণ্ডিত সিলেট জেলায় আছেন। তারপর তিনি অনুরোধ করলেন, আমি যদি দয়া করে তাঁর খালাসীদের

অসন্তুষ্টির কারণটি খোলসা করে বর্ণনা করি, তবে তিনি বড় উপকৃত হন। আমি তাই করলুম। তখন সেই খালাসীদের আর সারেঙ্গের ডাক পড়লো। তারা কুরবানীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হল।

কাপ্তান আর জজ ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী। সাক্ষীর বয়স কত, সেই আলোচনায় জজেরা হেসে খেলে সাতটি দিন কাটিয়ে দেন, কাপ্তানরা দেখলুম, তিনি মিনিটেই ফাঁসীর হুকুম দিতে পারেন। মসিয়ো ল্য কামাদাঁ অতি শান্ত কণ্ঠে এবং প্রাঞ্জল ফরাসিতে সারেঙ্গকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি আর কখনো এরকম কেলেঙ্কারীর খবর পান, তবে তিনি একটিমাত্র বাক্যব্যয় না করে সারেঙ্গকে সমুদ্রের জলে ফেলে তার উপর জাহাজের প্রপেলারটি চালিয়ে দেবেন।

যাক। বাঁচা গেল। মরবে তো মরবে সারেঙ্গটা।

পানির পীর বদর সায়েব। তাঁর কৃপায় রক্ষা পেয়ে 'বদর বদর' বলে কেবিনে ফিরলুম।

খানিকক্ষণ পরে চীনা কেবিন-বয় তার নিজস্ব ফরাসীতে বলে গেল, খালাসীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে আজ যেন আমি মেহেরবানী করে কেবিনে বসে তাদের পাঠানো 'ডাল-ভাত' খাই।

গোয়ালন্দী জাহাজের মামুলী রাইস-কারি খেয়েই আপনারা আ-হা-হা করেন, সেই জাহাজের বাবুর্চিরা যখন কোর্মা-কালিয়া পাঠায়, তখন কি অবস্থা হয়? নাঃ বলবো না। দু-একবার ভোজনের বর্ণনা করার ফলে শহরে আমার বদনাম রটে গিয়েছে আমি পেটুক এবং বিশ্বনিন্দুক। আমি শুধু অন্যের রন্ধনের নিন্দা করতেই জানি। আমার ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে। তামা-তুলসী স্পর্শ করে এই শপথ করলুম—নাঃ, থাক, আপনার বাড়ীতে আমার মা-বোনদের আমি একটি লাস্ট চান্স দিলুম।

কাপ্তান সাহেব আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছেন। খালাসীরা তাই এখন নির্ভয়ে খাবার নিয়ে আমার কেবিনে আসে।

এমনি করে করে জাহাজের শেষ রাত্রি উপস্থিত হল। সে রাত্রে খালাসীদের তৈরী গ্যাল-ব্যানকুয়েট খেয়ে যখন বাঙ্কে এ-পাশ ও-পাশ করছি, এমন সময় খালাসীদের মুরুব্বিটি আমার পায়ের কাছটায় পাটাতনে বসে হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, একটি নিবেদন আছে।'

মোগলাই খানা খেয়ে তখন তবিয়ৎ বেজায় খুশ। মোগলাই কণ্ঠেই ফরমান জারী করলুম, 'নির্ভয়ে কও।'

বললে, 'হুজুর ইটা পরগণার ঢেউপাশা গাঁয়ের নাম শুনেছেন?'

আমি বললুম, 'আলবৎ। মনু গাঙের পারে।'

বললে, 'আহা, হুজুর সব জানেন।'

মনে মনে বললুম, 'হায়, শুধু কাপ্তান আর খালাসীরাই বুঝতে পারলো আমি কত বড় বিদ্যেসাগর! যারা বুঝতে পারলে আজ আমার পাওনাদারদের ভয় ঘুচে যেত তারা বুঝল না।'

বললে, 'সেই গ্রামের করীম মুহম্মদের কথাই আপনাকে বলতে এসেছি, হুজুর। করীম ব্যাটা মহা পাষণ্ড, চোদ্দ বছর ধরে মার্সই (মার্সলেস) বন্দরে পড়ে আছে। ওদিকে বুড়ি মা কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি কানা করে ফেলেছে, কত খবর পাঠিয়েছে। হা— কিছুতেই দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে কিছু হল না দেখে আমরা বন্দরে নেমে তার বাড়ি গিয়েছিলুম, তাকে বোঝাবার জন্য। বেটার বউ এক রেওখেকী, এমন তাড়া লাগালে যে, আমরা পাঁচজন মদ্দা মানুষ প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার পথ পাইনে। তবে শুনেছি, মেয়ে মানুষটা প্রথম প্রথম নাকি তার ভাতারের দেশের লোককে আদর-কদর করতো। যবে থেকে বুঝেছে, আমরা তাকে ভাওচি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তালে আছি, সেই থেকে মারমুখো খাণ্ডার হয়ে আছে।'

আমি বললুম, 'তোমরা পাঁচজন লেঠেল যে কর্মটি করতে পারলে না, আমি সেইটে পারব? আমাকে কি গামা পাহলওয়ান ঠাউরেছো?'

বললে, 'না, হুজুর, আপনাকে কিছু বলবে না। আপনি স্যুট টাই পড়ে গেলে ভাববে আপনি এসেছেন অন্য কাজে। আমাদের লুঙ্গি আর চেহারা দেখেই তো বেটি টের পেয়ে যায়, আমরা তার ভাতারের জাত-ভাই। আপনি হুজুর, মেহেরবানি করে না বলবেন না, আপনার যে কতখানি দয়ার শরীর সে কথা বেবাক খালাসী জানে বলেই আমাকে তারা পাঠিয়েছে। আপনার জন্যই তো আজ আমরা ভাত—'

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে হয়েছে। কাপ্তান পাকড়ে নিয়ে শুধালো বলেই তো সব কথা বলতে হল। না হলে আমার দায় পড়েছিল।'

বললে, 'তওবা, তওবা। শুনলেও গুনা হয়। তা হুজুর, আপনি দয়া করে আর না বলবেন না। আমি বুড়ির হয়ে আপনার পায়ে ধরছি।'

বলে সত্য-সত্যই আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। আমি 'হা হা করো কি করো কি' বলে পা দুটো ছাড়ালুম।

ওরা আমাকে যা কোর্মা-পোলাও খাইয়েছে তার বদলে এ কাজটুকু না করে দিলে অত্যন্ত নেমকহারামী হয়। ওদিকে আবার এক ফরাসিনী দজ্জাল। ঝাঁটা কিম্বা ভাঙা ছাতা নয়, পিস্তল হাতে নিয়ে তাড়া লাগানোই ওদের স্বভাব।

কোন মূর্খ বেরয় দেশ ভ্রমণে! কত না বাহান্ন রকমের যতসব বিদকুটে, খুদার খামোখা গেরো।

বন্দরে নেবে দেখি, পরদিন ভোরের আগে বার্লিন যাবার সোজা ট্রেন নেই। ফাঁকি দিয়ে গেরোটা কাটাবো তারও উপায় আর রইল না। দু'জন খালাসী নেমেছিল সঙ্গে—ঢেউপাশার নাগরের বাড়ি দেখিয়ে দেবে বলে। তাদের পরনে লুঙ্গি, গায়ে রঙীন সার্ট, মাথায় খেজুর পাতার টুপি, পায়ে বুট, আর গলায় লাল কমফর্টার। ঐ

কমফর্টারটি না থাকলে ওদের পোশাকি সজ্জাটি সম্পূর্ণ হয় না— বাঙালীর যে রকম রেশমী উড়্নি।

দুই হুজুরে আমাকে 'হুজুর হুজুর' করতে করতে নিয়ে গেল বন্দরের এক সাবার্বে। সেখানে দূরের থেকে সন্তর্পনে ছোট্ট একটি ফুটফুটে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই তাঁরা হাওয়া হয়ে গেলেন। আমি প্রমাদ গুণতে গুণতে এগলুম। পানির পীর বদর সায়েবকে এখন আর স্মরণ করে কোনো লাভ নেই। তাই সোঁদরবনের ডাঙার বাঘের পীর গাজী সাহেবের নাম মনে মনে জপতে লাগলুম—যাচ্ছি তো বাঘিনীরই সঙ্গে মোলাকাত করতে।

বেশ জোরেই বোতাম টিপলুম—চোরের মায়ের বড় গলা।

কে বলে খাণ্ডার? দরজা খুলে একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অতিশয় নিরীহ চেহারার গো-বেচারী যুবতী এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। 'গো'-বেচারী বললুম তার কারণ আমাদের দেশটা গরুর। আসলে কিন্তু ওদের দেশের তুলনা দিয়ে বলতে হয়, 'মেরি হ্যাড এ লিটল্ ল্যাম্'—এর ভেড়াটি যেন মেরির রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ালো। ওদিকে আমি তৈরী ছিলুম পিস্তল, মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেডের জন্য। সামলে নিয়ে জাহাজে যে চোস্ত ফরাসিস আদব-কায়দার তালিম পেয়েছিলুম, তারই অনুকরণে, মাথা নীচু করে বললুম, 'আমি কি মাদাম মা-ও-মের (মুহম্মদের ফরাসী উচ্চারণ) সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ লাভ করছি?' ইচ্ছে করেই কোন দিশী লোক সেটা উল্লেখ করলুম না। ফরাসীরা চীনা ভারতীয় এবং আরবীদের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না। আমরা যে রকম চীনা, জাপানী এবং বর্মী সবাইকে একই রূপে দেখি।

চেহারা দেখে বুঝলুম মাদাম গুবলেট করে ফেলেছেন। বললেন 'আঁত্রে, (প্রবেশ করুন) মসিয়ো।' ভরসা পেয়ে বললুম, 'মসিয়ো মাওমের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

'অবশ্য।'

ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি শেখ করীম মুহম্মদ উত্তম ফরাসী স্যুট পরে টেবিলের উপর রকমারি নকসার কাপড়ের ছোট ছোট টুকরোর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

আমি ফরাসীতেই বললুম, 'আমি মাদ্রাজ থেকে এসেছি, কাল বার্লিন চলে যাবো। ভাবলুম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।' সে যে ভারতীয় এবং তার ঠিকানা জানলুম কি করে সে কথা ইচ্ছা করেই তুললাম না।...

ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে অভ্যর্থনা জানালো।

আমি ইচ্ছে করেই মাদামের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিলুম। মার্সেলেস যে কী সুন্দর বন্দর, কত রকম-বেরকমের রেঁস্তোরা-হোটেল্, কত জাত-বেজাতের লোক কত শত রকমের বেশভূষা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আরো কত কি।

ইতিমধ্যে একটি ছেলে আর মেয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি করে ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

কী সুন্দর চেহারা। আমাদের করীম মুহম্মদ কিছু নটবরটি নন, তার বউও ফরাসী দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত, কিন্তু বাচ্চা দুটির চেহারায় কি অপূর্ব লাবণ্য। কে বলবে এরা খাঁটি স্প্যানিস নয়? সেদেশের চিত্রকারদের অয়েল পেন্টিঙে আমি এ-রকম দেব-শিশুর ছবি দেখেছি। ইচ্ছে করে, কোলে নিয়ে চুমো খাই। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগলো পূর্বেই বলেছি, বাপের চেহারা তো বাংলা দেশের আর পাঁচজন হাল-চাষের শেখের যা হয় তা-ই, মায়ের চেহারাও সাধারণ ফরাসিনীর মত। তিন আর তিনে তা হলে সব সময় ছয় হয় না। দশও হতে পারে—ইনফিনিটি অর্থাৎ পরিপূর্ণতাও হতে পারে। প্রেমের ফল তাহলে অঙ্কশাস্ত্রের আইন মানে না।

মাদাম ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোদের বাবার দেশের লোক!' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি আদর করতেই বলে উঠলো, 'ল্যাঁদ,—সে ওঁ্য

প্যাই-ঈ ফাঁতাস্তিক নেস্‌পা ?'—অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ ফেনটাসটিক দেশ, সে দেশের অনেক ছবি সে দেখেছে, ভারি ইচ্ছে সেখানে যায়, কিন্তু কিন্তু বাবা রাজি হয় না—তুমি অঁকূল (কাকা), আমাকে নিয়ে চল,' ঐ ধরণের আরো কত কী!

আমি আবার প্রমাদ গুণলুম। কথাটা যে দিকে মোড় নিচ্ছে তাতে না মাদাম পিস্তল বের করে।

অনুমান করতে কষ্ট হল না, আলোচনাটা মাদামের পক্ষেও অপ্রিয়। তিনি শুধালেন, 'মসিয়োর রুচি কিসে?—চা, কফি, শোকোলা (কোকো), কিম্বা—'

আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তবু শেষটায় কফি বানাতে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে করীম মুহম্মদ উঠে দাঁড়িয়ে সিলেটি কায়দায় পা ছুঁয়ে সেলাম করতে গেল। বুঝলুম, ওর চোখ ঠিক ধরতে পেরেছে। আমি সিলেটিতেই বললুম, 'থাক থাক।'

যে ভাবে তাকালো তার থেকে বুঝতে পারলুম, সে আমার পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে না, সে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তার দেশের মুরুব্বিদের যাঁর ভিতর রয়েছেন আমার পিতৃ-পিতামহও, সে তার মাথায় ঠেকাচ্ছে দেশের মাটির ধুলো, তার মায়ের পায়ের ধুলো। আমি তখন বারণ করবার কে? আমার কি দম্ভ! সে কি আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে?

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করলে, 'হুজুর কোন হোটেলে উঠেছেন?' আমি নাম বললুম। স্টেশনের কাছেই।

আমি বললুম 'বসো'। সে আপত্তি জানালো না। তারপর দুজনই আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এমন সময় মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তার গালে চুমো খেয়ে বললুম, 'মধু'।

বাপ হেসে বললে, 'এবারে জন্মদিনে ওকে যখন জিজ্ঞেস করলুম, সে কি সওগাত চায়, তখন চাইলে ইণ্ডিয়ান বর। আমাদের দেশের মেয়েরা বিয়ের কথা পাড়লেই ঘেমে ওঠে।'

তার গলায় ঈষৎ অনুযোগের আভাস পেয়ে আমি বললুম, 'মনে মনে নিশ্চয়ই পুলকিত হয়। আর আসলে তো এসব বাড়ির, দেশের-দশের আবহাওয়ার কথা। এরা পেটের অসুখের কথা বলতে লজ্জা পায়, আমরা তো পাইনে।'

ইতিমধ্যে কফি এল। মাদাম বললেন, 'মেয়ের নাম সারা (Sara, ইংরিজিতে Sarah), ছেলের নাম রোমাঁ।' বাপ বললে, 'আসলে রহমান।' বুঝলুম লোকটার বুদ্ধি আছে। 'সারা' নাম মুসলমান মেয়েদেরও হয়। আর রহমানের উচ্চারণ ফরাসীতে মোটামুটি রোমাঁই।

বেচারী মাদাম। কফির সঙ্গে দিলে দুনিয়ার যত রকমের কেক্, পেস্‌ট্রি, গাতো, ব্রিয়োশ, ক্রোয়াসাঁ। বুঝলুন পাড়ার দোকানের যাবতীয় চায়ের আনুষঙ্গিক ঝেঁটিয়ে কিনে আনিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, প্যাজের ফুলুরিও। মাদাম বললে, 'ম মারি—ইল লেজ এম।' আমার স্বামী এগুলো ভালোবাসেন।

ছেলেটা চেঁচিয়ে বললে, 'মোয়া ওসি, মামি'—আমিও মা।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'মোয়া ও সি, মনোঁকল'—আমিও চাচা।

আমি আর সইতে পারলুম না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি সে সম্বন্ধে আমি সমস্তক্ষণ সচেতন ছিলুম। রেঁামার ভারত যাওয়ার ইচ্ছে, সারার ভারতীয় বরের কামনা এসব আমায় যথেষ্ট কাবু করে এনেছিল, কিন্তু ফ্রান্সের সেরা সেরা মিষ্টির কাছে ফুলুরির প্রশংসা—এ কোন্ দেশের রক্ত চেঁচিয়ে উঠে আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিলে?

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'আজ তবে আসি। বার্লিনের

টিকিট আমার এখনো কাটা হয়নি। সেটা শেষ না করে মনে শান্তি পাচ্ছিনে।'

সবাই চেঁচামেচি করতে লাগলো। ছেলেটা বললে, 'কিন্তু আপনি তো এখনো আমাদের এলবাম্ দেখেন নি।' বলেই কারো তোয়াক্কা না করে এলবাম এনে পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলো। 'এই তো বাজান (বাবা+জান, সিলেটিতে বাজান), কী অদ্ভুত বেশে এদেশে নেবেছিলেন, এটার নাম লুঙ্গি, না বাজান? কিন্তু ভারী সুন্দর, আমায় একটা দেবে, অঁক্‌ল—চাচা? বাবারটা আমার হয় না, (মাদাম বললেন, 'চুপ', ছেলেটা বললে 'পার্দোঁ।' অর্থাৎ বে-আদবি মাফ করো), এটা মা, বিয়ের আগে, ক্যাল্ এ জনি, কী সুন্দর—'

ওঃ!

গুষ্টিশুদ্ধ আমাকে ট্রাম টার্মিনাসে পৌঁছে দিতে এল। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বমহল্লা থেকে অন্তত একটা ট্রাম যায়—বিনা চেঞ্জে—স্টেশন অবধি। বিদেশীকে সেই ট্রামে বসিয়ে দিলেই হল। মাদাম কিন্তু তবু পই পই করে কণ্ডাক্টরকে বোঝালেন, আমাকে যেন ঠিক স্টেশনে নাবিয়ে দেওয়া হয়। 'মসিয়ো' এ (ত্) এত্রাজেঁর, স্ট্রেঞ্জার, বিদেশী, (তারপর ফিস্ ফিস্ করে) ফরাসী বলতে পারেন না—'

মনে মনে বড় আরাম বোধ করলুম। যাক তবু একটি বুদ্ধিমতী পাওয়া গেল, যে আমার ফরাসী বিদ্যের চৌহদ্দী ধরতে পেরেছে।

মাদাম, কাচ্চাবাচ্চারা চেঁচালে, 'ও রভোয়ার'।

করীম মুহম্মদ বললে, 'সেলাম সায়েব।'

আহারাদির পর হোটেলের লাউঞ্জে বসে উপরে ঘুমুতে যাবো যাচ্ছি যাবো যাচ্ছি করছি এমন সময় করীম মুহম্মদ এসে উপস্থিত। পরনে লুঙ্গি কম্‌ফর্টার।

ইয়োরোপের কোনো হোটেলে ঢুকে আপনি যদি লাউঞ্জে জুতো খুলতে আরম্ভ করেন, তবে ম্যানেজার পুলিস কিম্বা এম্‌বুলেনস্‌ ডাকবে। ভাববে, আপনি ক্ষেপে গেছেন। এ তত্ত্বটি নিশ্চয়ই করীমের জানা ; তাই তার সাহস দেখে অবাক মানলুম। বরঞ্চ আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তাকে বারণ করলুম। কিন্তু তারপর বিপদ, সে চেয়ারে বসতে চায় না। বুঝতে পারলুম, পরিবারের বাইরে এসে সে ঢেউপাশার 'কেরীম্যা' হয়ে গিয়েছে। জুতো পরবে না, চেয়ারে বসবে না, কথায় কথায় কদম্‌বোস্‌—পদচুম্বন—করতে চায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'একি আপদ!'

লজ্জা পেয়ে বললে, 'হুজুরের বোধহয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে। তাহলে, দয়া করে, আপনার কামরায়—'

আমি উষ্মা প্রকাশ করে বললুম, 'আদপেই না।' এবং এ অবস্থায় শ্রীহট্টের প্রত্যেক সুসন্তান যা বলে থাকে, সেটাও জুড়ে দিলুম—'আমি কি এঘরে 'মাগনা' বসেছি, না এদের জমিদারীর প্রজা। কিন্তু তুমি এ রকম করছো কেন? তুমি কি আমার কেনা গোলাম না কি? চলো উপরে।'

সেখানে মেঝেতে বসে একগাল হেসে বললে, 'কেনা গোলাম না তো কি? আমার চাচাতো ভাই আছমত ছিল আপনাদের বাসার চাকর। এখনো আমি মাকে যখন টাকা পাঠাই সেটা যায় আপনার সাহেবের (পিতার) নামে। আমি আপনাদের বাসায় গিয়েছি, আপনার আম্মা আমাকে চীনের বাসনে খেতে দিতেন। আমি আপনাকে চিনি হুজুর।'

আমি শুধালুম, 'বউকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ?'

বললে, 'না, হুজুর। খেতে বসে রোমাঁর মা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললে। আপনাকে যে রাত্রে খেতে বলতে

পারেনি তার জন্যে দুঃখ করলে। ও সত্যি বললে যে আপনাতে আমাতে বাড়িতে নিরিবিলি কথাবার্তা হবে না, তাই আপনাকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেনি। আসবার সময় বললে, 'উনি যা বলেন তাই হবে।'

আমি শুধালুম, 'বউ না বললে তুমি আসতে না?'

কিছুমাত্র না ভেবে বললে, 'নিশ্চয়ই আসতুম। তবে ওকে খামকা কষ্ট দিতে চাইনে বলে না বলে আসতুম।' বলে লাজুক বাচ্চাটির মত ঘাড় ফেরালে। আমার বড় ভালো লাগলো।

আমি শুধালুম, 'আমি তোমাদের বাড়িতে কি বলতে গিয়েছিলুম তোমরা জানলে কি করে? আর আমি শুনেছি, তোমার বউ দেশের লোককে তাড়া লাগায়? আমাকে লাগালো না কেন?'

যেন একটু লজ্জা পেয়ে বললো, 'তা একটু-আধটু লাগায় বটে, হুজুর ওরা যে বলে বেড়ায় আমাকে রোমাঁর মা ভ্যাড়া বানিয়ে রেখেছে সে খবরটা ওর কানে পৌঁছেছে। তাই গেছে সে ভীষণ চটে। আসলে ও বড় শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, ঝগড়া-কাজিয়া কারে কয় আদপেই জানে না।'

আর মানুষকে কি কখনো ভ্যাড়া বানানো যায়? কামরূপে না, কোনোখানেই না।

'আপনি তা হলে সব কিছু শুনে বিবেচনা করুন, হুজুর।'

'সতরো বছর বয়সে আমি আর পাঁচজন খালাসীর সঙ্গে নামি এই বন্দরে। কেন জানিনে, হুজুর, হঠাৎ পুলিস লাগালে তাড়া। যে যার জান নিয়ে যেদিকে পারে দিলে ছুট। আমি ছিটকে পড়লুম শহরের এক অজানা কোণে। জাহাজ আর খুঁজে পাইনে। শীতের রাতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় এক পোলের নিচে শুয়ে পড়লুম জিরবো বলে। যখন হুঁশ হল তখন দেখি আমি এক হাসপাতালে শুয়ে। জ্বরে সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে—দেশে আমার ম্যালেরিয়া হত। তারপর ক'দিন কাটলো হুঁশে আর বেহুঁশে তার

হিসেব আমি রাখতে পারিনি। মাঝে মাঝে আবছা আবছা দেখতে পেতুম, ডাক্তাররা কি সব বলাবলি করছে। সেরে উঠে পরে শুনতে পাই ওদের কেউই কখনো ম্যালেরিয়া রোগীর কড়া জ্বর দেখেনি বলে সবাই ভড়কে গিয়েছিল। আর জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে দেখতে পেতুম একটি নার্সকে। সে আমায় জল খাইয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু'দিক মুছে দিত। একদিন শেষরাতে কম্প দিয়ে এল আমার ভীষণ জ্বর। নার্স সব ক'খানা কম্বল চাপা দিয়ে যখন কম্প থামাতে পারলো না তখন নিজে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে রইল। দেশে মা যেরকম জড়িয়ে ধরতো ঠিক সেই রকম। তারপর আমি ফের বেহুঁশ।'

'কিন্তু এর পর যখন জ্বর ছাড়লো তখন আমি ভালো হতে লাগলুম। শুয়ে শুয়ে দেশের কথা, মায়ের কথা ভাবি আর ঐ নার্সটিকে দেখলেই আমার জান্‌টা খুশীতে ভরে উঠতো। সে মাঝে মাঝে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতো আর ওদের ভাষায় প্রতিবারে একই কথা বলতো। আমি না বুঝেও বুঝতুম, বলছে, 'ভয় নেই, সেরে উঠবে।'

তারপর একদিন ছাড়া পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলুম বন্দরের দিকে। সেখানে এক জাত-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। অন্য এক জাহাজের— আমাদের জাহাজ তো কবে ছেড়ে দিয়েছে। সে সব কথা শুনে বললে, 'ভাগো ভাগো, এখুনি ভাগো। তোমার নামে হুলিয়া জারী হয়েছে, তুমি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছ। ধরতে পারলেই তোমাকে পুলিস জেলে দেবে।'

'ক বছর? কে জানে। এক হতে পারে চোদ্দও হতে পারে। আইন-কানুন হুজুর আমি তো কিছুই জানিনে।'

'কিন্তু যাই-ই বা কোথায়? যেদিকে তাকাই সে দিকেই দেখি পুলিস।'

'খানা-পিনার কথা তুলবো না, হুজুর, সে তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু রাতটা কাটাই কোথায়?'

'শেষটায় শেষ অগতির গতির কথা মনে পড়ল। হাসপাতাল ছাড়ার সময় সেই নার্সটি আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে দিয়েছিল একখানা চিরকুট। তখনও জানতুম না, তাতে কি লেখা। যাকে দেখাই সে-ই হাত দিয়ে বোঝায় আরো উত্তরদিকে যাও। শেষটায় একজন লোক আমাকে একটা বড় বাড়ির দেউড়ি দেখিয়ে চলে গেল।'

'সেখানে ঘণ্টাতিনেক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রোঁদের পুলিশ আমাকে সওয়াল করতে লাগলো হাসপাতালে দু'মাস ওদের বুলি শুনে শুনে যে-টুকু শিখেছিলুম তার থেকে আমেজ করতে পারলুম, ওর মনে সন্দ হয়েছে, আমি কি মতলবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি— আর হবেই না কেন? বুঝলুম, রাশিতে জেল আছেই। মনে মনে বললুম, কি আর করি, একটা আশ্রয় তো চাই। জেলই কবুল। চাচা মামু অনেকেই তো লাঠালাঠি করে গেছেন, আমি না হয় না করেই গেলুম।'

'এমন সময় সেই নার্সটি এসে হাজির। পুলিসকে কি একটা সামান্য কথা বলে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেল তার ছোট্ট ফ্লাটে—পুলিস যেভাবে তাকে সেলাম করে রা'টি না কেড়ে চলে গেল তার থেকে আন্দেশা করলুম, পাড়ার লোক ওকে মানে।'

'আমাকে খেতে দিল গরম দুধের সঙ্গে কাঁচা আণ্ডা ফেটে নিয়ে। বেহুঁশির ওক্তে কি খেয়েছি জানিনে, হুজুর, কিন্তু হুঁশের পর দাওয়াই হিসেবেও আমি শরাব খাইনি। তাই 'বরাণ্ডিটা' বাদ দিল।'

'রাতে খেতে দিল রুটি আর মাংসের হালকা ঝোল। চারটি ভাতের জন্য আমার জান্ তখন কী আকুলি-বিকুলি করেছিল আপনাকে কখনো সমঝাতে পারবো না, হুজুর।'

জাহাজের খালাসীদের স্মরণে আমি মনে মনে বললুম, 'সমঝাতে হবে না।' বাইরে বললুম, 'তারপর?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললে, 'সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, সায়েব। আর কী-ই বা হবে বলে। ও আমাকে খাওয়ালে পরালে আশ্রয় দিলে—বিদেশে-বিভুঁইয়ে যেখানে আমার জেলে গিয়ে পাথর ভাঙবার কথা—এসব কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না বললে কি তার দাম কমে যাবে।'

'দাম কমবে না বলেই বলছি হুজুর, সুজন নার্সের কাম করে—'

আমি শুধালুম, 'কি নাম বললে?'

একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'আমি ওকে সুজন বলে ডাকি—ওদের ভাষায় সুজান।'

বুঝলুম ওটা ফরাসী SUZZANNE এবং আরো বুঝলুম, যে-জাতের লোক আমাদের দেশের মরমিয়া ভাটিয়ালী রচেছে তাদেরই একজনের পক্ষে নামের এটুকু পরিবর্তন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কিছু কঠিন কর্ম নয়। অতখানি স্পর্শকাতরতা এবং কল্পনাশক্তি এদের আছে।

আমি শুধালুম, 'তারপর কি বলছিলে?'

বললে, 'সুজন নার্সের কাম করে আমাকে যে এক বছর পুষেছিল তখন আমি তার বাড়ির কাজ করেছি। বেচারীকে নিজের রান্না নিজেই করতে হত—হাসপাতাল থেকে গতর খাটিয়ে ফিরে আসার পর। আমি পাক-রসুই করে রাখতুম। শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আপত্তি করেছে, কিন্তু আমি কান দিনি।'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু তোমার পাড়ার পুলিস কিছু গোলমাল করলে না।'

একটুখানি মাথা নিচু করে বললে, 'অন্য দেশের কথা জানিনে, হুজুর। কিন্তু এখানে মহব্বতের ব্যাপারে এরা কোনো রকম বাগড়া দিতে চায় না। আর এরা জানতো যে ওর বাড়িতে ওঠার একমাস পরে ওকে আমি বিয়ে করি।'

কিন্তু হুজুর, আমার বড় শরম বোধ হত। এ যে ঘর-জামাই হয়ে থাকার চেয়েও খারাপ! কিন্তু করিই বা কি?'

'আল্লাই পথ দেখিয়ে দিলেন।'

'সুজন আমাকে ছুটি-ছাটার দিনে সিনেমা-টিনেমায় নিয়ে যেত। একদিন নিয়ে গেল এক মস্ত বড় মেলাতে। সেখানে একটা ঘরে দেখি, নানা দেশের নানারকম তাঁত জড়ো করে লোকজনকে দেখানো হচ্ছে তাঁতগুলো কি করে চালানো হয়, সেগুলো থেকে কি কি নক্সার কাপড় বেরোয়। তার-ই ভিতর একটা দেখতে পেলুম, অনেকটা আমাদের দেশেরই তাঁতের মত।'

'আমার বাপ-ঠাকুরদা জোলার কাজ করেছে, ফসল ফলিয়েছে, দরকার হলে লাঠিও চালিয়েছে।'

অনেক ইতি-উতি কিন্তু কিন্তু করে সুজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তাঁতের দাম কত? বুঝতে পারলো, ওতে আমার শখ হয়েছে। ভারি খুশি হল, কারণ আমি কখনো কোনো জিনিস তার কাছ থেকে চাইনি। বললে, ওটা বিক্রীর নয়, কিন্তু মিস্ত্রী দিয়ে আমাকে একটা গড়িয়ে দেবে।'

'ও দেশে ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গী, গামছা কিনবে কে? আমি বানালুম, স্কার্ফ, কমফর্টার। দিশী নক্শায়। প্রথম নক্শার আধখানা ফুটতে না ফুটতেই সুজনের কী আনন্দ। স্কার্ফ তাঁত থেকে নামাবার পূর্বেই সে পাড়ার লোক জড়ো করে বসেছে, আজগুবি এক নূতন জিনিস দেখাবে বলে। সবাই পই পই করে দেখলে, অনেক তারিফ করলে। সুজনের ডবল আনন্দ, তার স্বামী নিষ্কর্ম্মা, ভবঘুরে নয়। একটা হুনুরী, গুণী লোক।'

'গোড়ার দিকে পাড়াতে, পরে এখানে সেখানে বিস্তর স্কার্ফ বিক্রি হল। বেশ 'দু' পয়সা আসতে লাগলো। তারপর এখানকার এক তাঁতীর কাছে দেখে এলুম কি করে রেশমের আর পশমের কাজ করতে হয়। শেষটায় সুজন নিয়ে এল আমার জন্য বহুৎ কেতাব,

সেগুলোতে শুধু কাশ্মীরী নক্‌শা নয় আরো বহুৎ দেশের বহুৎ রকম-বেরকমের নক্‌শাও আছে। তখন যা পয়সা আসতে লাগলো তারপর আর সুজনের চাকরী না করলেও চলে। সেই কথা বলতে সে খুশির সঙ্গে রাজী হল। শুধু বললে, যদি কখনও দরকার হয় তবে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে পারবে। রোমাঁ তখন পেটে। সুজন সংসার সাজাবার জন্য তৈরী।'

'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন বুড়ির কথা পাড়ছিনে। বলছি, হুজুর, রাতও অনেক ঘনিয়ে এসেছে, আপনি আরাম করবেন।'

'আপনি বিশ্বাস করবেন না দু'পয়সা হতে সুজন বললে, তোমার মাকে কিছু পাঠাবে না? আমি আগের থেকেই বন্দরে ইমানদার লোক খুঁজছিলুম। রোমাঁর মা-ই বললে, ব্যাঙ্ক দিয়েও নাকি দেশে টাকা পাঠানো যায়।'

'মাসে মাসে বুড়ীকে টাকা পাঠাই। কখনো পঞ্চাশ কখনো একশ'। ঢেউপাশাতে পঞ্চাশ টাকা অনেক টাকা। শুনি বুড়ী টাকা দিয়ে গাঁয়ের জন্য জুম্মা-ঘর বানিয়ে দিয়েছে। খেতে পরতে তো পারছেই।'

'টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয়, দেশে বলে, টাকার নাম জয়রাম, টাকা হইলে সকল কাম—কিন্তু হুজুর, টাকা দিয়ে চোখের পানি বন্ধ করা যায় না। একথা আমি খুব ভালো করেই জানি। বুড়ীও বলে পাঠিয়েছে, টাকার তার দরকার নেই, আমি যেন দেশে ফিরে যাই।'

'আমার মাথায় বাজ পড়ল, সায়েব; যেদিন খবর নিয়ে শুনলুম, দেশে ফিরে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ফিরে আসা অসম্ভব। আমি এখন আমার মহল্লার মুরুব্বিদের একজন। থানার পুলিসের সঙ্গেও আমার বহুৎ ভাব-সাব হয়েছে। আমার বাড়িতে প্রায়ই তারা দাওয়াৎ-ফাওয়াৎ খায়। তারা প্যারিস থেকে পাকা খবর

আনিয়েছে, ফিরে আসা অসম্ভব। মুসাফির হয়ে কিম্বা খালাসী সেজে পালিয়ে এলেও প্যারিসের পুলিস এসে ধরে নিয়ে দেশে চালান দেবে। এমন কি তারা আমাকে বারণ করেছে আমি যেন ঐ নিয়ে বেশী নাড়া-চাড়া না করি। প্যারিসের পুলিস যদি জেনে যায় আমি বিনা পাসপোর্টে এদেশে আছি তা'হলে তারা আমাকে মহল্লার পুলিসের কদর দেখাবে না। এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আপনি কি বলেন, হুজুর?'

তাহা মিথ্যা বলি কি প্রকারে? আমার বিলক্ষণ জানা ছিল, ফ্রান্স চায় টুরিস্ট্ সেদেশে এসে আপন গাঁটের পয়সা খরচা করুক, কিন্তু তার বেকারির বাজারে কেউ এসে পয়সা কামাক এ অবস্থাটা সে যে করেই হোক রুকবে।

আমি চুপ করে রইলুম দেখে করীম মুহম্মদ মাথা নিচু করে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে।

অনেক্ষণ পর মাথা তুলে বললে, 'রোমাঁর মা আমার মনের সব কথা জানে। দেশের লোক ভাওচি দেয়, আমি ভেড়া বনে গিয়েছি এ-কথা বলে—এসব শুনে সে তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভোরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখি সেও জেগে আছে। তখন আমার কপালে হাত দিয়ে সে বলে, তোমার দেশে যদি যেতে ইচ্ছে করে, তবে যাও। আমি একাই বাচ্চা দুটোকে সামলাতে পারবো। এ-সব আরম্ভ হল, ও নিজে মা হওয়ার পরের থেকে।'

'আজ আপনার কথা তুলে বললে, 'এ ভদ্রলোকের শরীরে দয়ামায়া আছে। আমার ছেলেমেয়েকে কত আদর করলেন।' আমি বললুম, সুজন, তুই জানিসনে, আমাদের দেশের ভদ্রলোক আমাদের কত আপনজন। এই যে ভদ্রলোক এলেন, এঁর সায়েব (পিতা) আমার বাবাকে 'পুত্তী' (ছেলে) বলে ডাকতেন। এদেশের ভদ্রলোক তো গরীবের সঙ্গে কথা কয় না। আপনি-ই বলুন, হুজুর।'

তার 'আপনজন'। ঐটুকুই বাকী ছিল।

'সুজনই আজ বললে, ওঁর কাছে গিয়ে তুমি হুকুম নাও। উনি যা বলেন তাই হবে। এইবার আপনি হুকুম দিন, হুজুর।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ করো।'

সে আমার পায়ে ধরে বললে, 'আপনার বাপ-দাদা আমার বাপ-দাদাকে বিপদে-আপদে সলা দিয়ে হুকুম করে বাঁচিয়েছেন। আজ আপনি আমায় হুকুম দিন।'

আমি নির্লজ্জের মত পূর্ব-ঐতিহ্য অস্বীকার করে বললুম, 'তুমি আমায় মাপ করো।'

অনেক কান্নাকাটি করলো। আমি নীরব।

শেষ রাত্রে আমার পায়ে চুমো খেল। আমি বাধা দিলুম না। বিদায় নিয়ে বেরবার সময় দোরের গোড়ায় তার বুক থেকে বেরল, 'ইয়া আল্লা!'

কথাটা মনে পড়ল সেদিন সকালে বাথরুমে। একটু অদ্ভুতভাবে। হাতে আমার টুথব্রাশ, সামনে টুথপেষ্টের টিউব। মাসের শেষ, তাই টিউব প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। যখন ভর্তি থাকে তখন আস্তে আমি ওটার লেজের দিকে চাপ দিই, আর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ টুথপেষ্ট। কম নয়, বেশী নয়। কিন্তু যে টিউব তার অন্তিম অবস্থায় পৌঁছেছে তার সাধ্য নেই অমন মিতাচারী হবার। তাই আমার ফুরিয়ে-আসা টিউব সম্বন্ধে যখন আমার মনে সন্দেহ ছিল আধ ইঞ্চি পেষ্টও তার মধ্যে আছে কি না, তখন স্বভাবতই আমি ওটার গলা টিপলুম জোরে, আর অমনি বেরিয়ে এলো প্রয়োজনাতিরিক্ত টুথপেষ্ট, প্রায় দু ইঞ্চি। অপচয় হলো। কিন্তু আমার ততক্ষণে মাজনের কথা মনে ছিল না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অজিত ঘোষের মুখ। ওর দশা হয়েছে আমার ওই টুথপেষ্ট-টিউবটার মতো। সবই প্রায় ফুরিয়ে গেছে। বাকী যা আছে তা মাথায় এসে উঠেছে। ওর আর সাধ্য নেই হিসেবী হবার। মাথার দিকে একটু টিপলে বেরিয়ে আসে বেহিসেবী দু' ইঞ্চি।

* * *

অজিত ঘোষের টিউব যখন ভর্তি ছিল তখন আমি ওকে জানতুম না। আমি ছাড়া প্রায় সবাই জানতো। আজো কলকাতায় এমন প্রধান ব্যক্তি অফিসে ক্লাবে অল্পই আছেন যাঁদের সঙ্গে অজিত অন্তরঙ্গ নয়। ম্যাকনিল কোম্পানীর নম্বর ওয়ান মিষ্টার উইলিয়াম

আর্চারকে অজিত বিল্ বলে ডাকে অনায়াসে। ওয়ালটার হ্যারিসন কোম্পানীর বড়ো সায়েব আর সবায়ের কাছে অ্যাণ্টনী ক্যাম্বেল হতে পারে, অজিতের কাছে অনেক দিন থেকে টো[illegible]য় মাত্র। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয়, কেন না অজিত ঘোষ প্রথম সারির একটা ম্যানেজিং এজেন্সির অফিসে প্রবেশ করেছিল এমন দিনে, যখন ওই সব চাকরীতে অল্প ভারতীয়দেরই প্রবেশাধিকার ছিল। সরকারী চাকরীতে আই, সি, এস, বা আই, পি, যেমন একদিকে আর আজকালকার আই, এ, এস, অপর দিকে, অজিতের সঙ্গে স্বরাজোত্তর নেতাজী সুভাষ ষ্ট্রীটের কালো সাহেবদের ব্যবধান ততখানি বা তার চেয়েও বেশী। অজিত শুধু য়ুরোপীয়ান কভে-না[illegible]িস্টাণ্ট ছিল না, তার নিয়োগ হয়েছিল বিলাতে, যার নাম [illegible] হোম অ্যাপয়েন্টমেণ্ট। অজিতের অধিকার ছিল এই চাকরীতে। ওর পিতামহ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, ওর বাবা ছিলেন স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় আই, এম, এস-দের অন্যতম। ওর নিজের শৈশব কেটেছে ইংল্যাণ্ডে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর পাবলিক স্কুলে, ছুটি কাটতো সুইজারল্যাণ্ডে বা দক্ষিণ ফ্রান্সে, পিতামহী ও পরে মায়ের সঙ্গে।

প্রথমে কাজ করেছিল হোম অফিসে, পরে বদলী হয় প্রথমে করাচী শাখায়, তারপরে বম্বেতে এবং সবশেষে কলকাতায়। এটা অজিতের কাছে শোনা নয়, যাঁরা জানেন বলেন, অজিত এতদিন ওর কোম্পানীর ডিরেক্টর হতো নিশ্চয়ই। এখন ওর জায়গায় অন্য ভারতীয় আছেন।

এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল এইটা বোঝাতে যে এত উপরে ছিল বলেই অজিতের পরবর্তী পতনে এত শব্দ হয়েছিল, আজো এসম্বন্ধে গল্প শোনা যায় এমহলে ওমহলে। এত উপর থেকে পড়েছে বলেই ওর নিজের আঘাত লেগেছিল এত বেশী।

বাইরে থেকে অনেকের কাছেই অজিত-পতন আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল। অত বড়ো বাড়ী একদিনে ধ্বসে যায় না। নীচে থেকে ত[illegible]ভিত ক্ষয়ে যাচ্ছিল অনেক দিন থেকেই, কিন্তু অজিতের বাইরের জীবনযাত্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন কেউ দেখতে পায়নি। রেসে অজিতকে দেখা গেছে আগেকার মতো। তফাৎ যদি কেউ লক্ষ্য করতো তবে শুধু দেখা যেতো যে অজিত আগের চাইতে একটু বেপরোয়া এবং দুটো রেসের মধ্যে সে বারে যেন একটু বেশী সময় কাটাচ্ছে। ক্যালকাটা ক্লাবে আগেও অজিতের নিত্য উপস্থিতির কথা সবাই জানতো। দু'একজন ছাড়া কেউ লক্ষ্য করেনি যে অজিত আগে কেউ ডাবল্ চাইলে তাকে বর্বর মনে করতো[illegible]ন সে নিজেই ডাবল্ ছাড়া নেয় না। তারও কিছুদি[illegible]ান জিজ্ঞাসা করেছিল, "আজ জিন কেন সাহেব?" [illegible] একটু জোর করে হেসে দিয়েছিল, "আজ স্থবেসে জিন পিতা থা, উসি লিয়ে। ঔর এক।"

অজিতের সমৃদ্ধিতে এই সামান্য ফাটল তার থ্রী হ্যাণ্ড্রেড ক্লাবের বন্ধুরাও লক্ষ্য করেনি। সেখানে তার প্রতাপ যেমন ছিল তেমন আছে। বন্ধুদের দৃষ্টি সন্ধ্যার সামান্য পরেই আচ্ছন্ন না হলে তারা দেখতো, অজিত বারোটার পর কী রকম যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। একটা প্রচ্ছন্ন কিন্তু অপ্রতিরোধ্য কিছু ওকে যেন সজোরে দমিয়ে রাখতে সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে হচ্ছে। কারো চোখে পড়েনি এসব। তারা ভেবেছে, এমন হয় সবায়েরই। কেউ কোন দিন বা কয়েক দিনের জন্য বেশি খায়, তারপর কম। অজিত যে মাসের পর মাস ওই অধিক পানের পর্য্যায়ে থেকে গেছে তা বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি তার প্রধান কারণ তার উদারতা অক্ষুন্ন ছিল। ঠিক আগেকার মতো সে সই করেছিলো বন্ধুদের জন্য। দেড়টা দুটোর সময় কেউ যদি বাড়ী যাবার কথা বলতো অজিত তাকে গায়ের জোরে ধরে রাখতো। অজিত যে সত্যি তার সঙ্গ চায় না, শুধু নিঃসঙ্গতাকে

ভয় পায়, এটা সঙ্গীদের মনে না হলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না নিশ্চয়ই।

দিনের বেলায় অজিত অফিসের কাজ করতো। [illegible] কাজের গুণাগুণে যদি কোনো তারতম্য ঘটে থাকে তা বাইরের লোকের জানার কথা নয়। দু'চারজন সহকর্মী লক্ষ্য করেছিল, অজিত বেশীর ভাগ দিন বাইরে লাঞ্চ খাচ্ছে। কেউ মন্তব্য করেনি, কেননা এমন হওয়া বিস্ময়কর নয়। অজিতকে কিছুটা এণ্টারটেইন করতেই হয়। দু'চারজন কেরাণী লক্ষ্য করে থাকবে, অজিত লাঞ্চের পরে একটু বেশী মেজাজ গরম করে। বলা বাহুল্য তাদের কারো সাহস ছিল না, এ নিয়ে কথা বলবার। শুধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, ঘোষ স[illegible]জকাল মাত্রা একটু চড়িয়ে দিয়েছে। [illegible]সঙ্গত বলে নের[illegible]জিতের পতনের পরে কেরাণীরা এই সময়কার ঘটনাগুলির উপর অনেক প্রলেপ দিয়ে অনেক রসাল কাহিনী রচনা করেছে। কেরাণীদেরও দোষ দেয়া উচিত হবে না, তার বন্ধুরাও পরবর্তীকালে প্রচুর কাহিনী [illegible]না করে তার অনুপস্থিতিতে পরিবেশন করে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

* * *

কিন্তু আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক। রেসে বেশী হেরেই হোক, বা ষ্টক এক্সচেঞ্জে বেশী লোকসান দিয়েই হোক, অজিতের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। অফিসের কাজে মন বসাতে পারে না। বাইরে টাকা রোজগারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় অজিত এমন কয়েকটা কাজ করতে বাধ্য হলো যা কিছুদিন আগেও পাবলিক স্কুলের সন্তান অজিত ঘোষের পক্ষে একান্তই অভাবনীয় ছিল। এমনি সময় তার সর্বনাশ সম্পূর্ণ করবার জন্য তার স্ত্রী জয়া কলকাতা ছেড়ে চলে গেল দিল্লীতে তার বাবার কাছে। অজিতের দশা হলো সেই নৌকোর মতো যা থেকে মাঝি লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে গেছে পারের দিকে।

জয়াকে দোষ দেবার অধিকার আমার নেই। আমি তাকে কখনো দেখিওনি। আমি শুধু ঘটনার বর্ণনা করেছি নৌকার উপমা দিয়ে, মাঝিকে দোষ দিতে নয়। এর পরেই অজিত কয়েকদিন আর অফিসে গেল না। অফিস থেকে যখন টেলিফোন এসেছিল তখন সে বাইরে। আফিসেও খবর কিছু কিছু পৌছল বড়ো সাহেবের কানে। তিনি প্রথমে এসব গ্রাহ্য করেননি। অজিত তাঁর প্রিয়পাত্র। সাহেবের নেশা রাগ্‌বির আর রাগার খেলতে অজিত ছিল উৎসাহী ও পারদর্শী। কিন্তু ক্রমে সাহেব অধৈর্য্য হলেন। আরো খবর নিয়ে বিব্রত হলেন। এখন তিনি করবেন কী? বরাবর তিনি ভাল রিপোর্ট দিয়ে এসেছেন অজিত সম্বন্ধে। এখন কি করে ফিরিয়ে নেবেন সব কথা? অথচ কিছু ব্যবস্থা না করেও [illegible]। ক্রমে অজিতের দুর্নাম উপচে পড়বে কোম্পানীর [illegible]র আগেই অজিতকে নিয়ে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করে? এদিকে দেখাও নেই অজিতের।

এই দিনগুলির ইতিহাস একটু অস্পষ্ট। শুধু এই জানি যে কয়েকদিন পরে বড়ো সায়েব একটি চিঠি পান অজিতের। অজিত পদত্যাগ করেছে। পদত্যাগপত্রের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছে, সে এখন বিপদে পড়েছে। কিন্তু এই বিপদ নিয়ে সে কোম্পানীকে বিব্রত করবে না। তার সায়েবকে তো নিশ্চয়ই নয়, তাই এই পদত্যাগ। তাড়াতাড়ি গৃহীত হলে বাধিত হবে। তাছাড়া প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি পেলে সুবিধা হয়।

সায়েব যতটা দুঃখিত হলেন প্রায় ততটাই আশ্বস্ত হলেন। কোনো একটি ভারতীয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট যেন কি বলতে গিয়েছিল অজিতের সম্বন্ধে। সায়েব ধমকে বললেন, "আই অ্যাম সরি ফর অজিত। বাট ডোণ্ট ফরগেট, টু দি লাষ্ট, হি হ্যাজ প্লেড দি গেম। ইন রিজাইনিং লাইক দিস হি হ্যাজ এগেন অ্যাক্টেড অ্যাজ এ

জেণ্টলম্যান। হি হ্যাজ ডান ইকজাক্টলি হোয়াট হিজ স্কুল উড হ্যাভ উইশড।”

*　　　　*　　　　*

“জেণ্টলম্যান”—এই কথাটা অজিতের সম্বন্ধে আমি যে কতবার শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এই পাবলিক স্কুলের তৈরী জেণ্টলম্যানের কথা আমি ইংরেজি উপন্যাসে প্রবন্ধে পড়েছি। অজিতের সঙ্গে দেখা হতে তাই আমার কৌতুহল স্বভাবতই জাগরিত হলো। প্রত্যক্ষ পরিচয় হোক জেণ্টলম্যানের সঙ্গে। যদি কেউ বলে এটা আমার জন্মগত স্নবারির অন্যতম পরিচয়, তবে সে ভুল করবে। জেণ্টলম্যান কথাটা খাস বিলেতেই বিদ্রূপের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাকে দেখা যায় কার্টুনে বা হাসির গল্পে। দ্বিতীয়তঃ আমার সঙ্গে অজিতের দেখা হয় তখনই যখন তার জেণ্টলম্যানত্ব অন্তিমে এসে উঠেছে, আমার সেই টুথপেষ্টের টিউবের মতো।

খাতে খাতে বলি। অজিত তখন ক্যালকাটা ক্লাবে পোস্টেড, কেউ বলে আড়াই হাজার কেউ সাড়ে তিন। থ্রী হাণ্ড্রেড ক্লাবে তার প্রবেশ নিষেধ। প্রথম কারণ, বাকী হাজার ছয়েক। আর দ্বিতীয় কারণ, শেষদিনে সে মত্তাবস্থায় মারামারি করেছিল কোন রাণার সঙ্গে। অজিতের স্বাস্থ্য সহস্র রজনীর লক্ষ অমিতাচারেও ভেঙে পড়েনি। নাক ভেঙেছে রাণার। ক্লাবে ক্লাবে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সব ক্লাবের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল অজিতের মুখের উপর। শুধু ক্লাবগুলির নয়, অনেক বন্ধুর বাড়িরও। অজিত তখন একা। সঙ্গী খোঁজে আপন বন্ধুশ্রেণীর বাইরে। সেখানে জেণ্টলম্যান নেই, ভদ্রলোক আছে। কিন্তু ক্লাস ওয়ার থাক। অজিতের জেণ্টলম্যানত্বের পরিচয় আমি খুব স্পষ্ট ভাবে কখনো পাইনি। কিন্তু ওকে আমার খারাপ লাগতো না। ওর ব্যবহারে একটা স্বাভাবিক সৌজন্য ছিল। ও বিলাতী হোটেলে গিয়ে এমনভাবে অর্ডার দিতো যেন হোটেলের

মালিকই অজিত ঘোষ। বেয়ারারা ওকে দেখেই বুঝতো ও সায়েবের জাত, আদেশ দিয়েই ওর অভ্যাস। বেয়ারারা পছন্দ করে এই জাতকে। এরা আট আনা বখশিস দিয়ে যে সেলাম পায় তা নবাগতদের জোটে না দ্বিগুণ বখশিস দিলেও। দ্বিতীয়রা বেশী বখশিস দিলে তারা ভাবে, নতুন কি না, আমাদের কিনতে চায় টিপ্‌স্ দিয়ে, বোকা কোথাকার। অজিতের আরো গুণ ছিল। ও গল্প জানতো ভুরি ভুরি। ইংরেজিতে যাকে স্মাটি গল্প বলে তার ষ্টক ছিল ওর বিরাট, ওর নির্ভুল উচ্চারণে সেই সমস্ত কাহিনী বলে ও হাসাতে পারতো সবাইকে। আমাকেও। মোদ্দা কথা আমি ওকে পছন্দ করতুম। পছন্দ করতুম এতদূর পর্য্যন্ত যে, ও যে দু'তিনবারে আমার কাছ থেকে শ' দুয়েক টাকা ধার করেছে তা ধার দেবার সময় আমার আদৌ মনে হয়নি।

* * *

পরে জেনেছি আমি অজিতের একমাত্র উত্তমর্ণ নই। মাসের পর মাস চলে গেছে, অজিত ধার শোধত দেয়ইনি, তার উল্লেখ মাত্র করেনি কোনো দিন। সমস্ত বিষয়টাই যেন অশ্লীল, ভালগার। টাকা পয়সা নিয়ে আলোচনা করবে, যাদের টাকা-পয়সা নেই, এই মধ্যবিত্ত বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। জেণ্টলম্যান তার সঙ্গে পর্যন্ত টাকা রাখে না, কেননা তার সই গ্রাহ্য হয় সর্বত্র। অজিতের এই অবস্থা ঘুচে গেছে অনেককাল,' কিন্তু অভ্যাসটা যায়নি। এদিকে আমারও ওই শ'দুয়েক টাকার আসন্ন কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাই তাগাদা দিইনি। তবু ভালো লাগতো না। যার পকেটে পয়সা নেই, সে কেন রোজ রোজ অন্যের পয়সায় মদ খাবে? যার নিজের সাধ্য নেই অন্যের আতিথ্য ফিরিয়ে দেবার, সে কেন গ্রহণ করবে সকলের আতিথ্য?

ইতিমধ্যে একদিন কার কাছে যেন শুনলুম যে, অজিত গত শনিবার রেসে গিয়েছিল এবং সেখানে তিনশো না অমনি কত টাকা

হেরে এসেছে। এমন খবরে আমার খুশি হবার কথা নয়। আমি তাই অজিতের এক ভূতপূর্ব বন্ধুকে বললুম, বস্তুত সেই আমাকে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অজিতের সঙ্গে,—"অজিত আমার কাছ থেকে দু'শো টাকা ধার করেছিল বেশ কয়েক মাস আগে। সেটা ফিরিয়ে না দিয়ে, হি হ্যাজ নো বিজনেস টু গো অ্যাণ্ড লুজ মনি অ্যাট দি রেসেস।"

বন্ধু বলল, "তোমার তো মাত্র দুশো টাকা। আরও কতজনের কাছে ওর কত ধার তার ঠিকানা নেই। হয়ত হঠাৎ হাতে পেয়েছিল শ'তিনেক টাকা। সে ওর ধারের সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। তাই নিশ্চয়ই ভেবেছে, রেসে গিয়ে ওই টাকাটা বাড়ানো যাক, অন্তত দুচারজনের দেনা শোধ করে নতুন ধার নেবার পথ করা যাবে।"

আমার তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। আমি সোজা আমার টেলিফোনের কাছে গিয়ে অজিতকে ডাকলুম।

"হ্যালো।"

"ঘোষ হিয়ার।"

সেই গলা, যেন অজিত এখনও অমুক কোম্পানীর সবচেয়ে সিনিয়র ভারতীয় অ্যাসিষ্টাণ্ট। আমার নাম আমি ঘোষণা করলুম।

অজিত বললে, "অহো! যুগ যুগ ধরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর, কি খবর? আজ সন্ধ্যায় কি করছো?"

সন্ধ্যায় অজিতের সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ আমার অজানা ছিল না। আমি তাই একটু ইতস্তত করে বললুম, "তা অনেকদিন দেখা হয়নি। কিন্তু, কিন্তু, তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। আমার—"

অজিত আমার কথা শেষ হতে দিল না। বলল, "আজ সন্ধ্যায় বাড়ী থাকবে? আমি চলে আসব, এই ধরো এইটিশ্, কি বলো?"

একটু নিরাশ হলুম, কিন্তু সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের পরে সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলুম। মনে মনে স্থির করলুম, সন্ধ্যায় অজিত এলে সকল সঙ্কোচ শিকায় তুলে টাকাটা দাবী

করবো। অজিতের বন্ধুর কাছে ফিরে এসে বললুম, "দি সেম ওল্ড অজিত। অ্যাণ্ড ভেরি ক্রাফ্‌টি টু। আমাকে কথাটা তুলতেই দিল না।" অজিতের বন্ধু বলল, "না, ও বুঝেছে তুমি ধারের কথাটা বলতে সঙ্কোচ করছ। তোমার ওই এমব্যারাসমেন্ট বাঁচাবার জন্যই তোমাকে বলতে দেয়নি। আজ সন্ধ্যায় এসে অন্তত কিছু টাকা তোমায় নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে। ভুলো না, অজিত ইজ এ জেণ্টলম্যান।"

জেণ্টলম্যান! আমার বিরক্তি বাড়ল।

*　　　*　　　*

অজিত এলো সেই সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে। আমার একটু দেরী হয়েছিল ফিরতে। কিন্তু আমার বেয়ারার সঙ্গে অজিতের দোস্তি। আমি এসে দেখি বেয়ারা বাড়ী নেই, আমার বসবার ঘরে অজিত আরামে বসে আছে। মাথার ওপরের পাখাটাই শুধু খোলেনি, কাছের আর একটাও। মুখে সিগারেট; সামনে আমার সিগারেটের টিন খোলা, তাই বুঝতে কষ্ট হয় না কার সিগারেট পুড়ছে। বুঝে কষ্ট হয়।

আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অজিত বলল, "আমি একটু পাঠিয়েছি তোমার বেয়ারাকে।" তারপর বেশ কিছু সময় নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে, যোগ করল, "তোমার ফ্রিজে দেখলুম একদম বরফ নেই। আমি বাবলুকে টেলিফোন করে দিয়েছি কিছু বরফ দিতে।"

অজিত এমন স্বাভাবিক স্বরে কথা বলছিল, এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে চলাফেরা করছিল যে, আমি তাকে প্রায় ঈর্ষা করলুম। আমি কেন এমন স্বাভাবিক হতে পারিনে। এতটুকু এদিক থেকে ওদিক হলে কেন আমার ভাবনার শেষ থাকে না? কোথাও একটা বিল দিতে দেরী হলে কেন ভেবে মরি? অথচ অজিতকে দেখো। তারই অন্যতম উত্তমর্ণের সঙ্গে কেমন অবিশ্বাস্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে ব্যবহার করছে। আমারই বাড়িতে এসে এমনভাবে কথা বলছে যেন বাড়ীটা

ওরই। আমিই যেন আগন্তুক। শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হলো, আমিই ওর কাছ থেকে টাকা ধার করেছি, না, ও আমার কাছ থেকে ? এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও মুহূর্ত্তের জন্য নিজের কাছে কবুল না করে পারলুম না—না, পাবলিক স্কুলের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান প্রগতিশীল মত যাই হোক না কেন, সেখানে ওটা চিরকালের মতো গেঁথে দেওয়া হয় যে, তুমি দুনিয়ার মালিক। তুমি কারো চেয়ে হীন নও, হেয় নও। প্রভুত্বে তোমার জন্মগত অধিকার। নেতৃত্বে তোমার দাবী প্রশ্নাতীত। আর সব মানুষ 'মেন', তুমি অফিসার। এই গুণ সওদাগরী অফিসে যেমন দেখা যাবে, তেমনি দেখা যাবে ক্লাবে, আবার ঠিক তেমনি দেখাতে হবে বার্মার অঞ্চলে বা ডুবন্ত জাহাজে।

এই ডুবন্ত জাহাজের সঙ্গে অজিতের তৎকালীন অবস্থার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য তার নিজেরও অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু সে যে ক্যাপ্টেন তাতে কারো সন্দেহ করবার অবকাশ ছিল না। অজিতকে এমন "মাষ্টার অব দি সিচুয়েশন" আমি অনেকদিন দেখিনি। আমার তাই টাকার সামান্য প্রশ্ন উত্থাপন করবার কথা মনেও এল না। আমি প্রায় হেসে বললুম, "কী ব্যাপার, য়ু সীম টু বি ফুল অব বীন্‌স্।"

"হোয়েন হ্যাভ আই নট বিন ?" কথাটা বলে অজিতেরই মনে হলো, একটু সংশোধন চাই। বলল, "মাঝে কয়েকটা মাস বাদে।" আবার অট্টহাস্যে যোগ করল, "কিন্তু সে সব শেষ হয়ে গেছে। অনেকদিন আমার কোনো পার্টি হয়নি। গত জন্মদিনে আমি কাউকে খাওয়াইনি। তুমি আমায় খাইয়েছিলে। আজ আবার একটা গ্র্যাণ্ড পার্টি হবে, যেমন এক সময় হতো ক্যালকাটা ক্লাবে বা থ্রী হাণ্ড্রেডে প্রায়। ওহো! তোমাকে তো বলাই হয়নি। দেবদান—অব্ ছত্তিশগড়—হো হো—রাত তিনটের সময় আমি ওকে বডিলি তুলে বাড়ি পৌঁছেছিলুম। বর্দ্ধমানকে জিজ্ঞেস করো ;

আমার অন্য একটা ফেমাস্ পার্টিতে রুণুর কি অবস্থা হয়েছিল। রুণু অব্ সেরাইগাঁও।"

*　　　　*　　　　*

এগুলি অজিতের পক্ষে চাল নয়। সত্যি ওর অতীতে এমন সহস্র পার্টির স্মৃতি ওর মনে এখনো গাঁথা হয়ে আছে। এখন গায়ে একটা বুশ সার্ট, পরনে খাঁকি ট্রাউজার্স, কিন্তু জুতো পুরানো হলেও চকচকে। অনেকগুলি ভাল অভ্যাস ওর সুদিনের সঙ্গে বিদায় নেয়নি, দুর্দিনের উপহাস হয়ে বেঁচে আছে। আমি ওর স্মৃতি মন্থনে বাধা দিয়ে বললুম, "আজকের পার্টি মানে? কোথায়? কাকে, কাকে বলেছ?"

"এইখানে, রাইট্ হিয়ার। আমার ফ্ল্যাটের চেহারা এখন এমন নয় যে, ভদ্র কাউকে ডাকতে পারি। তাই তোমার এখানে আসতে বলেছি, এখনি এসে পড়বে। হয়তো এখন যে লিফ্‌ট্ উঠছে সেইটেতেই দু'চারজন আসছে।"

অবাক কাণ্ড। আমার বাড়িতে অজিতের পার্টি। একবার অনুমতি নেবার কথা ওর মনে হয়নি। ওইযে আগেই বলেছি, অজিত পাবলিক স্কুলের সন্তান। ও পৃথিবীর মালিক। আমি শুধু একবার বললুম, "একটু আগে বলতে হয়। কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো আয়োজন নেই।"

অজিত বলল, "আমি তোমার বেয়ারারের সঙ্গে সব ঠিক করে ফেলেছি। মায় খাবার পর্যন্ত।" ঘড়ি দেখে বলল, "সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। বাবলু্ শুড হ্যাভ বীন হিয়ার উইথ দি হুইস্কি বাই নাউ।"

অজিতের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু্ এলো। তার পিছনে লিফট্‌ম্যান আনলো একটা পরিচিত আকার ও ছাপের কাঠের বাক্স। অজিত জিজ্ঞাসা করল, "সোডা কোথায়?"

"লীভ ইট টু মি, বস। লিফ্‌টেই আছে।" বাবলুর ওই

অভ্যাস। যে ওকে খাওয়াবে, তাকেই বস্ বলবে। ও বাঙালী হলেও লাহোরে পড়েছে। তাই অনেকগুলি পাঞ্জাবী অভ্যাস ওর চরিত্রে এসে গেছে। কিন্তু অজিতকে অনেকদিন কেউ বস্ বলেনি, বাবলুও না। অজিতের ভালো লাগল।

ধারের কথাটা আমার তখন ঠিক মনে ছিল না বোধহয়, কিন্তু ভালো আমার লাগছিল না। কী দরকার ছিল এই পার্টির? তাছাড়া অজিতের পার্টি সম্বন্ধে আমি যা জানতুম তাতে অস্বস্তি বাড়ছিল বই কমছিল না। নিজের বাড়ীতে ওরকম পার্টি হয়, ভাড়াটে ফ্ল্যাটে নয়। আমার ডানদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন একটি ফিরিঙ্গী পরিবার, ভদ্রলোক ক্যাথলিক অ্যাসোসিয়েশনের উৎসাহী কর্মী। আমার বাঁদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন মদ্র এক বড়ো চাকুরে, রেলওয়ের বোধহয়। তাঁর বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে যে শব্দ কানে আসে, তা আমোদের নয়, পুজোর ঘণ্টার। এঁরা সব কি বলবেন?

কিন্তু আমার কিছু করবার উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে অজিতের দশজন বন্ধু এসে হাজির হয়েছিলেন। ছয় বোতল হুইস্কি এসে গিয়েছিল। পর্যাপ্ত সোডা। যাঁরা জলের সঙ্গে খান, তাঁদের জন্য জল। বরফ। খাবার। একজন অতিথি ছিলেন সঙ্গীতে উৎসাহী। তিনি এসেই আমার রেডিওটা খুলে দিয়েছিলেন। আরেকজন অতিথি ছিলেন, নিজে গায়ক। তিনি হিন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধরেছিলেন। কথারও কমতি ছিল না, বলাবাহুল্য। সব মিলিয়ে তাই হচ্ছিল, যা এমন পার্টিতে হয়ে থাকে।

অজিত নিজেকে অবহেলা না করে অভ্যাগতদের দেখাশোনা করছিল। কিন্তু কথা বলছিল না বেশী। পাঁচ বোতল যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন রাত সাড়ে দশটা। যারা যেতে চাইল অজিত

তাদের বাধা দিল না। হাসতে হাসতে "গুড বাই" বলল। গৃহস্বামী হিসাবে আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করলুম তাদের লিফ্‌ট্ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে। একে একে সবাই গেল, বাকি রইল অজিত, তার এক বন্ধু (যার নামটা আমি ধরতে পারিনি), আর আমি। আর সর্বশেষ বোতলের সিকি বা তারও কম। অজিত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাতের উপর হাত রেখে বলল, "আই থিংক ইট হ্যাজ বীন এ ফাইন পার্টি, ডোণ্ট য়ু এগ্রী ?"

আমি আন্তরিক সম্মতি জানালুম। অজিতের বন্ধুও। লোকটি দেখতে একটু বোকা বোকা, বেশী কথা বলে না।

এবার অজিত তার বন্ধুর দিকে চেয়ে বলল, "নাউ ফর এ স্পট্ অব্ বিজনেস্।"

আমার তখন ব্যবসায় সংক্রান্ত কথায় কিছুমাত্র কৌতুহল ছিল না। আমি তখন ক্লান্ত। তাই নীরব রইলুম। তাছাড়া কথাটা আমাকে বলা নয়।

অজিত বলল, "তার আগে একটা লাষ্ট ড্রিঙ্ক হোক।"

আমি জানতুম, আপত্তি বৃথা। তাই গেলাস এগিয়ে দিলুম। অজিত তিনটে গ্লাসে সমান ভাগে ভাগ করে শেষ হুইস্কি পরিবেশন করল। "নাউ ফর দি রিচুয়াল।"

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বলতে হবে না, অনুষ্ঠানটি কী। অজিত একটা দেশলাই ধরিয়ে কাঠিটা শূন্য বোতলে ফেলে দিতেই হুস্ করে এক টা শব্দ হলো, জানা গেলো ভিতরে খাঁটি জিনিস ছিল। পর পর ছটা বোতলের সশব্দ ময়না-তদন্তে আমি আমার প্রতিবেশীদের কথা ভাবছিলুম। কিন্তু অনুষ্ঠানের যে একটা প্রতীকমর্ম ছিল, তা আমার জানবার কথা নয়।

সবশেষে অজিত আবার চেয়ারে বসল সোজা হয়ে, বলল, "নাউ ফর দি বিজনেস্।" অজিতকে দেখে তখন আমার মনে হলো, সত্যি সে একদিন বড়ো বিলাতী অফিসে বিভাগীয় বড়ো সাহেব ছিল

চাকরী গেছে, কিন্তু আর সব কিছু বজায় আছে। সেই বিশাল চেহারা, সেই গম্ভীর স্বর, সেই ইংরাজী অ্যাকসেন্ট।

*   *   *

"কানু, আমার বন্ধু বিশেষ অবশিষ্ট নেই।"

পানে মানুষ একটু ভাবপ্রবণ হয়। ভদ্রলোক বললেন, "বেশী আছে কি না জানিনে, তবে একজন নিশ্চয়ই আছে।"

"নেমলী ?"

"মী।"

"ভেরি ওয়েল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?"

"নিশ্চয়ই।" ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। সতর্কতার সঙ্গে একটু পরে যোগ করলেন, "নিশ্চয়ই, এনিথিং রিজনেব্‌ল্‌।"

"যদি বলি, কারো কারো কাছে অনুরোধটা পুরোপুরি রিজনেব্‌ল্‌ না-ও মনে হতে পারে ?"

"লুক অজিত, য়ু নো, আমি পাঁচ পুরুষ বড়লোক নই। আমি নিজে গত বিশ বাইশ বছর কি করেছি, তা আন্দাজ করা তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। তারপর কিছু টাকা গেছে ব্যারাকপুরের বাড়ীটায়। অতএব আমার সঙ্গতির মধ্যে যা সম্ভব—আমার যা যা কমিটমেণ্ট আছে—তা আমি নিশ্চয়ই করব।"

"ডোণ্ট গেট মি রং। আমার অনুরোধে তোমার আর্থিক ক্ষতি হবে না আশা করি।"

"না, না, আমি তা ভাবিনি। আমি শুধু—"

অজিত হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, "আচ্ছা আমার স্বাস্থ্যটা কেমন আছে ? এত অনিয়ম ও অমিতাচারের পরও ?" বলে, অজিত একবার তার রাগবী-খেলা কব্জি ঘোরাল। বুকের ছাতি স্ফীত হলো। সত্যি ওর স্বাস্থ্যটা দেখবার মতো।

বন্ধু কানু তারিফ করে বললে, "চমৎকার স্বাস্থ্য। আমি বলব, এ-ওয়ান।"

"গুড্।"

অজিত একচুমুকে তার গেলাস শেষ করে বলল, "এই চিঠিটা নাও। সীল করা আছে। এরই মধ্যে আমার অনুরোধ আছে। কাল অফিসে যাবার আগে এটা খুলতে পারবে না।"

কানু হেসে বলল, "ছাটস্ ফানি। কাল কেন?"

অজিত রহস্য হালকা করে বলল, "শুধু এইজন্য যে, অফিস যাবার আগে আমার অনুরোধ সম্বন্ধে কিছু তুমি করতে পারবে না।" হেসে যোগ করল, "আমি জানি, তোমার চেক বই তুমি বাড়িতে রাখো না।

কানু এবার আর হাসল না। তার মনে সন্দেহ ছিল না, আমারও না, যে অজিত আরও একটা ধার চাইছে। অজিতের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাই কি স্বাভাবিক নয়?

কানু বলল, "আচ্ছা কথা দিলুম, কাল অফিসে যাবার আগে তোমার চিঠি খুলব না।"

এর কিছুক্ষণ পরেই কানু বিদায় নিল। আমি ক্লান্ত বলে ক্ষমা চাইলুম। লিফ্‌ট্ পর্যন্ত গেলুম না। অজিত যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। অমি ভাবছিলুম, এবার উঠলে তো হয়। আমার কাল অফিস আছে।

*　　　*　　　*

অজিত বল্‌ল, "যদি কিছু মনে না করো, আই'ল্ হ্যাভ অ্যানাদার ড্রিঙ্ক। হ্যাভ য়ু গট সাম হুইস্কি ইন দি হাউস?"

কিছু ছিল। অজিতের এমন আতিথেয়তার পরে, তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব কী করে? কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছিল। বললুম, "তুমি নিজেই বের করে নাও, প্লাজ, আমি উঠতে পারছি না।"

অজিত ধন্যবাদ দিয়ে উঠল। নিজের গেলাসে যা ঢালল, তার নাম পাতিয়ালা পেগ্। আমি দেখেও দেখলুম না। অজিত বলল, "এবার তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"বলো।"

"তোমাকে একটা পোস্ট-ডেটেড চেক দেব, ফর দি ফুল অ্যামাউন্ট। আর তুমি এখন আমায় গোটা ছুয়েক টাকা দেবে, ফর দি ট্যাক্সি। বাবলু আমার চেঞ্জটা ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেছে।"

আমি অফিসের ট্রাউজারস্ পরেই বসে ছিলুম। পকেট থেকে ক্লান্ত হয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমি অজিতকে দিলুম।

অজিত একটা সীল করা খাম আমার হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, এটা অবশ্য চেক নয় ঠিক, বরং হুণ্ডি বলতে পারো। পরশু টাকাটা পাবে, কার কাছে ইত্যাদি লেখা আছে এর মধ্যে। তার আগে খুলো না কিন্তু।"

আমি বললুম, "ছ্যাটস্ অল রাইট্।"

অজিত উঠলে, আমি বললুম, "গুড বাই।"

আমি লিফ্‌টের কাছে গিয়ে হঠাৎ কি মনে করে জিগ্যেস করলুম, "আচ্ছা, এই কানু কে? একে আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।"

"না। তুমি বোধহয় দেখনি।"

"কি করে? কোন অফিসে?"

"না, ও চাকুরে নয় তোমার মতো। ওর নিজের বড়ো ব্যবসা আছে, যদিও নামকরা নয়। ব্যবসা এক্সপোর্টের।"

আমি আর কিছু জানতে চাইলুম না। বললুম "গুড নাইট্।"

লিফ্‌টে নামতে নামতে অজিত বলল, "গুড বাই।"

* * *

এবার ফিরে আসা যাক আমার বাথরুমে। সেইখানে আমার টুথপেস্টের টিউবে চাপ দিয়ে অজিতের কথা মনে হয়েছিল।

পরপ্রভাতে আমার মাথা ধরেছিল। আমি স্নান সেরে অফিস গেলুম। তারও পরের দিন অজিতের চিঠি খুলে দেখলুম।

"আমার বন্ধু কানাই গুপ্তকে এই চিঠি দেখালে, সে তোমাকে দু'শো পঞ্চাশ টাকা দেবে। রসিদ দিতে হবে না। ঋণ এতদিন শোধ দিতে পারিনি বলে ক্ষমা চাইছি। আরো অনেকের কাছেই আমার এই রকমের ধার আছে, মোট প্রায় হাজার কুড়ি। মোটামুটি এই রকম অঙ্কই কানাই দেবে বলে আশা করছি। আমার স্বাস্থ্য ভালো।"

"আর একটা অনুগ্রহ চাইব। তুমি টাকা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। আর কিছু জানতে চাইবে না। আমার কি হলো তাও নয়, তাহলেই আমার জন্য বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।"

"কানাই কেন টাকা দেবে তাও নয়, তাহলেই তোমার বন্ধুর অন্তিম উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো হবে।"

"না, যাবার আগে তোমার কাছে সত্য গোপন করব না। কানাই এক্সপোর্টের ব্যবসা করে। কী রপ্তানী করে শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট্যাল হয়ো না। এর চেয়ে নৃশংস ব্যবসাও আছে, শুধু সেগুলোতে আড়াল আছে আর আমার বন্ধুর বেলায় তা নেই। সে মানুষ মারে না। মরা মানুষের শব চালান দেয় বিদেশে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। আমি ব্যবস্থা করেছি কাল বিকালের মধ্যে আমার শব ওর কারখানায় যাবে। ওর এজেণ্ট আমার ফ্ল্যাটে আসবে ভোর চারটেয়, তাই তোমার পার্টি থেকে দুটোর আগে আমায় বেরুতেই হবে।"

"কানাইকে লেখা চিঠিতে দুটি শর্ত করেছি। এক, আমার সমস্ত দেনা, ও শুধবে। তাতে যদি ওর লাভের মার্জিন একটু কম থাকে তাহলেও। আমি জানি, ও আমার কথা রাখবে, মান রাখবে।"

"দুই, আমি ওকে বলেছি, আমার শরীর হার্ড কারেন্সীর বদলে ও আমেরিকায় পাঠাবে না। আমার এ অনুরোধও রাখবে। আমার বাসনা ছিল, দক্ষিণ ফ্রান্সে মরা। একটু সংশোধিত আকারে

সে বাসনাও পূর্ণ হতে চললো। পৃথিবীকে আমি ভোগ করেছি। তাই এমন নিমকহারামী করব না যে, বলব, যেতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু খুব বেশী খেদ নেই। সান্ত্বনা, দুর্নাম নিয়ে বিদায় নিচ্ছি না। বোলো আমি ভদ্রলোক ছিলুম।"

এ গল্পে সে কথাটাই বলা রইলো।

কথাবার্তা

"প্রেমের জন্য।"

এমন অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার চমকে না উঠে উপায় ছিল না। আমার জিজ্ঞাসা ছিল অতি সাধারণ, আমাদের দু'জনের অদীর্ঘ ও অনন্তরঙ্গ পরিচয়ের পরিধির ভিতরে। মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমি এত কম জানিনে যে, কোনো ব্যক্তির সব কিছু জানবার ছেলেমানুষী দূরাশা পোষণ করব। আবার এত বেশীও জানিনে যে, কোনো কিছুতেই বিস্মিত হব না। আমি জিমকে শুধু প্রশ্ন করেছিলাম, কেন সে দেশের কথা ভুলে গত বিশ বছর থেকে সিঙ্গাপুরে স্বেচ্ছানির্বাসনে আছে। আমার প্রশ্ন ছিল মামুলী, ভেবেছিলাম জিমেরও উত্তর হবে মামুলী—অর্থের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, কেননা ইংল্যাণ্ডের শীত তার সয়না, বা এমনি কোন কারণ। আমার এই উক্তির মধ্যে এতটুকু কপটতা নেই যে, সেই মুহূর্তে ফুয়ং বা ফেলিসিটির কথা আমার আদৌ মনে ছিল না।

আমি এমনিতেই বহুভাষী নই। বিস্ময়ে আরো অবাক হই। তাই স্বভাবতঃ আত্মগোপনবিলাসী ইংরেজ জিম হাটন যখন অকস্মাৎ একান্ত লৌকিক জিজ্ঞাসার উত্তরে তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের অনালোকিত অধ্যায় আমার সামনে অনাবৃত করল তখন আমার নীরব থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

"কী, আমার সহজ উত্তরে বিব্রত হলে নাকি?"

"বিব্রত নয়। তবে—"

"নাঃ, আমরা দু'শো বছর শাসন করে তোমাদের একেবারেই নষ্ট করেছি মনে হচ্ছে।"

"কংগ্রেস তাই বলে।"

"হ্যাং য়োর কংগ্রেস। আমি ভাবছিলাম তোমাদের হাস্যকর ভিকটোরিয়ান মরালিটির কথা। প্রেমের উল্লেখ মাত্র তোমার লজ্জার সীমা রইল না। আলোটা জ্বালা থাকলে দেখা যেত তোমার গালের রঙ বদলে গেছে, যেমন যেত আমার বুড়ী পিসিমার। যদি বলতাম আমার কেরীয়ারের জন্য প্রাচ্যে আছি, তোমার কাছে তা নিতান্তই স্বাভাবিক মনে হতো।"

"হ্যাঁ, কেরীয়ারের জন্য অনেকে অনেক কষ্ট বরণ করেছে বৈকি। বিশেষ করে ইংরেজ জাতি। ওই নোয়েল কাওয়ার্ডই তো গেয়েছেন, পাগলা কুকুর আর ইংরেজ ছাড়া দুপুরের রোদে কে বেরোয়?

The Japanese don't care to,
The Chinese wouldn't dare to,
Hindoos and Argentines sleep firmly
from twelve to one.

বলা বাহুল্য, আমি সামান্য হিন্দু মাত্র।"

"সত্যি তোমরা একেবারেই ইংরেজ হয়ে গেছ।"

"আমার ধারণা, আমি এইমাত্র ঠিক বিপরীত নিবেদন করছিলাম।"

"সেটাও ইংরেজের কাছ থেকে শেখা, ভাবনার বিপরীত চলা।"

জিম তার পাইপ ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালল। আলোতে দেখলাম, জিম হাসছে। হাসিতে শ্লেষ ছিল না, কৌতুক ছিল। আমি জানতাম তর্ক বৃথা।

"বুঝলে ভারতসন্তান, তোমরা আমাদের গাল দাও একেবারে বাজে কারণে। রাজনীতিক পেষণ, অর্থনীতিক শোষণ, এসব তো সামান্য ব্যাপার। দুদিনে তোমরা এসব ক্ষত সারিয়ে ফেলবে। অন্তত আমি তাই আশা করছি। কিন্তু কখনো শুনলাম না

আমাদের বিরুদ্ধে সত্যকার অভিযোগটা। আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হওয়া উচিত ছিল এই যে, আমরা তোমাদের হৃদয়বৃত্তির বিকৃতি সাধন করেছি। তোমাদের এমোশনাল রেসপন্‌স্ পঙ্গু করে দিয়েছি।"

"অর্থাৎ আমরা তোমাদের যথোপযুক্ত ঘৃণা করতে পারিনি?"

"কোয়াইট! কিন্তু আমাদের ঘৃণা করতে না পারার চেয়েও বড়ো ক্ষতি হয়েছে, তোমরা ভালোবাসতে ভুলে গেছ।"

"গান্ধীর দেশে ভালোবাসা নেই? আ ওয়েল, গান্ধীর দেশ বলেই তোমার কথার প্রচণ্ডতর প্রতিবাদ থেকে বিরত রইলাম।"

"গান্ধী তো খৃষ্টিয়ান ছিলেন।"

"ওটা যে তিরস্কার তা তো জানতুম না।"

"আমি পেগান আমার কাছে ওটা তিরস্কার বৈকি?"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। তোমাকে যখন বলছিলাম, 'প্রেমের জন্য', তখন আমি যীশুর প্রেমের কথা ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম ভালোবাসার কথা।"

"ফুয়ং-এর কথা নিশ্চয়ই নয়?"

জিম হঠাৎ থেমে গেল। কবুল করব, আমার জিজ্ঞাসায় ঝাঁজ ছিল।

"ফুয়ংকে তুমি জানো অতি সামান্য, আজ সকালে তোমার সঙ্গে বড়ো জোর ঘণ্টা দুয়েক কথা হয়ে থাকবে। আমি ফুয়ংকে জানি বিশ বছর থেকে। ১৯৩৬-এর ১৭ই জানুয়ারী ফুয়ং-এর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, সে ছিল ট্যাক্সি ডান্‌সার্। তার এক সপ্তাহ পর থেকে আমরা একসঙ্গে আছি। একবার সে তার মাকে দেখতে গিয়েছিল সাতদিনের জন্য, একবার আমি পেনাঙে গিয়েছিলাম দশ দিনের জন্য। তাছাড়া আমরা আলাদা থাকিনি। আমি ফুয়ংকে জানি।"

"ঠিক একই কারণে মনে করা সম্ভব, ফুয়ং তোমাকে জানে।"

"হয়তো মিথ্যা বলোনি। হয়তো কেউই আমরা কখনই কাউকে জানিনে। যা ভাবতে ভাল লাগে, তাই ভাবি আর মনে করি, জানি।"

জিম হাটনের বলিষ্ঠ কণ্ঠে এমন নৈরাশ্য আশা করিনি। বলা বাহুল্য, আমি সাধারণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভেবেছিলাম, সাতদিনের পরিচয়ে জিমকে আমি জানি।

"আচ্ছা, ফুয়ং তোমাকে আজ সকালে কী বলেছে?"

"বলার চেয়ে কেঁদেছে বেশী।"

"হয়তো আমারই দোষ।"

"ফুয়ং-এর ধারণা অনুরূপ।"

"আচ্ছা, ফুয়ং কি ফেলিসিটির সঙ্গে দেখা করেছে?"

"ঠিক জানিনে। তবে ফেলিসিটিকে সে বান্ধবী বলে মনে করে না এমন আভাস পেয়েছি।"

"বোধহয় আমার বান্ধবী বলে মনে করে?"

"তা নইলে, ফুয়ং কেন সিঙ্গাপুর থেকে উড়ে আসবে, তার কারণ খুঁজে পাইনে।"

"তোমাকে তাহলে ফুয়ং অনেক কিছু বলেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"যা বলবার ছিল তার শতাংশ বলেনি, এমন ধারণা নিয়ে ফিরেছি।"

"আমায় কিন্তু কিছু বলেনি।"

"বলবে বলেই এসেছিল নিশ্চয়। পরে মত পরিবর্তন হয়ে থাকবে।"

"আমার কোনো কাজের জন্য নয় নিশ্চয়ই?"

"তাও জানিনে, তবে আগেকার কোনো কাজ, যার কথা সে এখন মাত্র জেনেছে, এমন হওয়া বিচিত্র নয়।"

"সত্যি অদ্ভুত। কলকাতা এসেছিলাম বহু পুরানো এক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য। এসে দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। তুমিও জড়িয়ে পড়লে।"

"দোহাই তোমার, জিম। আমি জড়িয়ে পড়িনি, পড়তে চাইনে। বলো তো এক্ষুনি উঠব, উঠে সোজা বাড়ি যাব। তুমি আর ফুয়ং আর ফেলিসিটি আপন অভিরুচি অনুযায়ী আপন আপন সমস্যার মীমাংসা করবে। আমি কে?"

"কেউ নও। এমন কি আমিও কেউ নই। অথচ সবাই আমরা এই জটিল উপন্যাসের পাত্রপাত্রী হয়ে পড়েছি। কেউ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ করতে সমর্থ নই, তবু আমাদের দিয়ে অনেকগুলি কাজ করানো হবে এবং সেজন্য আমাদের দায়ী করা হবে।"

"অর্থাৎ আমরা নিমিত্ত মাত্র? কথাটা এদেশে প্রচলিত।"

"তা নয়তো কী? তুমি কি ইচ্ছা করে এর মধ্যে আসতে চেয়েছিলে?"

"না। এবং, আশা করছি, আসিনি।"

"তবু তো গিয়েছিলে ফুয়ং-এর সঙ্গে দেখা করতে!"

"না গিয়ে—"

"আমিও তো ঠিক তাই বলছিলাম। না গিয়ে উপায় ছিল না। তারপর ধরো ফেলিসিটির অভিশাপের লক্ষ্য হওয়া, তাই কি তুমি চেয়েছিলে?"

"গুড গড! আমি আবার তার অভিশাপের লক্ষ্য হতে গেলাম কী করে?"

"কিছু না করে। আর সেই কথাই তো বলছিলাম, তবেই হয়েছে। এই যে আমার সঙ্গে বসে কথা বলছ এটাই ফেলিসিটির অভিশাপ কুড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। তারপর আছে ফুয়ং-এর অভিশাপ।"

"ফুয়ং-এর অভিশাপ ? না জিম, মিথ্যে নিজেকে ভোলাচ্ছ, তার অভিশাপ সবটা তোমার পাওনা।"

আমি ভেবেছিলাম, জিমকে আমি তার শ্লেষের সমুচিত উত্তর দিয়েছি। সাডার স্ট্রিটের ছোট হোটেলে এর চেয়ে বড়ো উত্তর সম্ভব ছিল বলে বিশ্বাস করিনে।

"আচ্ছা বেশ, তুমি তাই ভেবে সান্ত্বনা পাও। কিন্তু কাজ ও কৃতকর্মের ফল, এই দুয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে তোমার আস্থা সত্যি করুণ।"

"বেশ, তুমি হিন্দুকে গীতা শেখাও। আমি কিন্তু তোমাকে বাইবেল শেখাব না।"

"রক্ষা করো—আমাকে নয়, বাইবেলকে।"

"আচ্ছা ফুয়ং কি খৃষ্টিয়ান ?"

"বোধহয়। কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু তোমার প্রশ্নেরই মধ্যে বিরাট একটা অজ্ঞতা রয়ে গেছে। তোমার কি ধারণা, বাইরের কোনো ধর্মের আরোপে আদিম চরিত্র বদলে যায় ? কোনো ভারতীয় খৃষ্টিয়ান-ধর্ম অবলম্বন করলে সে কি অন্য মানুষ হয়ে যায় ? আমি তো বৌদ্ধ-ধর্ম অবলম্বন করেছি। আমি কি আর য়ুরোপীয় নই ? এশিয়াটিক হয়ে গেলে, কই, তুমি তো আমাকে এখনো এশিয়ার লোক বলে গ্রহণ করোনি ?"

"তা হয়তো সত্যি করিনি। কিন্তু এখানেও অন্য কারণ থাকা সম্ভব। বলিষ্ঠ কোনো জাতি যখন পরধর্ম গ্রহণ করে তখন সে ধর্মেরই চেহারা বদলে যায়, যেমন খৃষ্টিয়ানিটি আর খৃষ্টিয়ানিটি থাকেনি কনস্টেন্টাইনের পরে।"

"বা বৌদ্ধধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম থাকেনি আমার বৌদ্ধ হবার পরে, না ?"

"না, তা বলিনি। অন্ততঃ এইজন্য যে, তুমি যে বৌদ্ধ, তাও এর আগে আমার জানা ছিল না।"

“সেই কথাই তো এতক্ষণ বোঝাতে চাইছিলাম তোমাকে। তুমি শুধু ফুয়ং-এর ভাষ্য শুনেছ। আমার যে কিছু বলবার থাকতে পারে, আমি যে সে ভাষ্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ পাপিষ্ঠ না হতে পারি এমন সম্ভাবনা তোমার মনেও আসেনি।”

“আমি অত সহজে লোককে বিচার করিনে। কাউকে পাপিষ্ঠ বলবার আগে শতবার ভাবি।”

“এবং শতবার ভেবে আমাকে পাপিষ্ঠ বলেছ, তাই কি?”

“তোমাকে পাপিষ্ঠ এখনো বলিনি। আশা করছি, কখনো বলতে হবে না।”

“তবু বলতে হয়তো হবে। ওই যে তোমাকে বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে, আমরা কী করি তা হয়তো জানি, কিন্তু, ওফীলিয়া যা বলেছিল, কী করতে পারি তা কখনো জানিনে।”

“আমি শেকসপীরিয়ন ট্র্যাজিডির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু।”

“আমি কোনো রকম ট্র্যাজিডিই চাইছিলাম না!”

“তবু—”

“তাই তো বলছিলাম, আমাদের জীবনে যা ঘটে, তার অল্পই আমাদের ইচ্ছার অনুসারী।”

এই বাক্যটা শেষ হয়েছিল কি না মনে নেই। ঠিক সেই মূহূর্ত্তে যে ঘরে এসে প্রবেশ করল একটা গরম হাওয়ার মতো, তার নাম ফুয়ং। আমি চেয়ার থেকে পড়ে যাইনি, কিন্তু পড়ে গেলে কারো বিস্মিত হবার কারণ ছিল না। সেদিন সকালেই ফুয়ং আমায় বলেছিল, সে আর জিম হাটনের মুখ দর্শন করবে না, শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণরূপ তার এ জীবনের মত দেখা হয়ে গেছে।

জিম যথারীতি উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ যে!

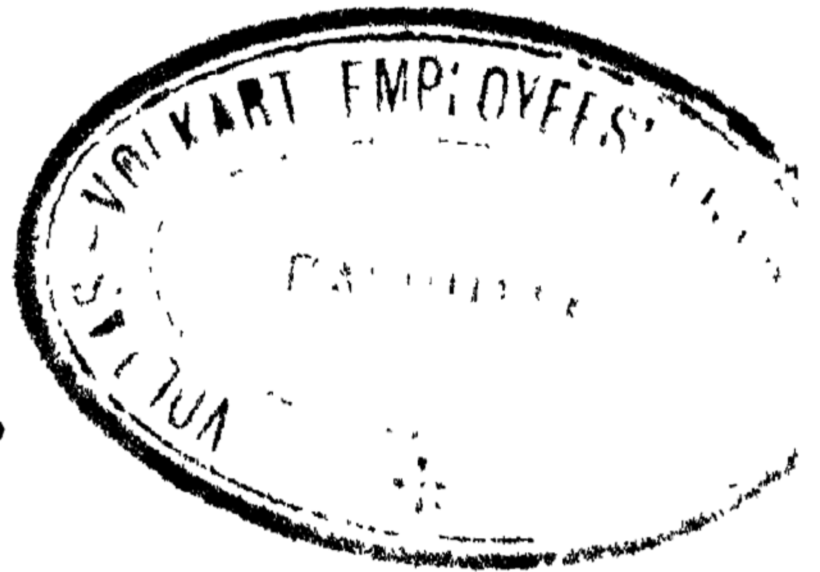
“এসো ফুয়ং আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।”

“পরিচয় আমার আগেই হয়ে গেছে, সে খবর তোমার জানা।”

“ও, হ্যাঁ, তাও তো বটে।”

ফুয়ং বসল একটা চেয়ারে। আমি বিদায় চাইলাম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবস্থান, যুদ্ধের দিনের বেলি ব্রিজের মতো, নদী পার হয়ে সৈনিকেরা ওগুলো ভেঙে ফেলে। কিন্তু ফুয়ং-এর নির্দ্দেশে বসতে হলো, জিমেরও। এটা স্পষ্টতঃই স্বামী-স্ত্রীর দেখা নয়।

"এই তোমার চেক বই।"



"কিন্তু ফুয়ং—"

"আর এই তোমার উইল—"

"কিন্তু ফুয়ং—"

"আর এই তোমার দেয়া আংটি।"

"ফুয়ং আমাকে তুমি—"

"আর তো কিছুই ফিরিয়ে দেবার নেই। আর তো কিছু দাওনি। আমি তো তোমার রক্ষিতা বৈ আর কিছু ছিলাম না। গরমের দেশে, গরম মেয়ে নিয়ে কিছুদিন খেলা—"

"বিশ বছর।"

"এখনো ওটা ভয়ানক দীর্ঘ মনে হচ্ছে, তাই না?"

"ফুয়ং—"

"পিটারের জন্য ভেবো না, ও পুরোপুরি আমার মতো দেখতে। কেউ জানবে না, ওর পিতৃত্ব য়ুরোপীয়।"

"আমি আর য়ুরোপীয়ান নই, ফুয়ং, তুমি জানো।"

"এই সেদিনও তাই জানতাম। যাক, আমার আর সময় নেই। তিন ঘণ্টা পরে আমার প্লেন ছাড়বে।"

হঠাৎ দরজার একেবারে কাছে গিয়ে ফুয়ং দাঁড়াল। এবার কণ্ঠে ঝাঁজ নেই, করুণ কমনীয়তা আছে।

"জানো জিম, আমার বাবার একটি রক্ষিতা ছিল। মা কোনোদিন অভিযোগ করেনি। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে যার মালয়ে যতগুলো ব্রাঞ্চ অফিস ততগুলো রক্ষিতা। আমার বোন তা মেনে নিয়েছে। পুরুষের একনিষ্ঠতায় যে নারীর

দাবী থাকতে পারে, এ কথা তুমিই শিখিয়েছিলে। তাই সইতে পারছিনে।”

জিম অন্য ভাষায়, বোধহয় ম্যাণ্ডারিনে, কী যেন বলল। ফুয়ং কোনো ভাষায়ই উত্তর দিল না। বেরিয়ে গেল। ছোট মেয়ে, অন্ততঃ দেখে তাই মনে হয়। ছোট ছোট পা। এত সরু কোমর আমি এর আগে দেখিনি। স্কার্টের নীচের দিকটা, হাঁটুর কাছে, দু'দিকে কাটা, তাই বোধহয় হাঁটা সম্ভব হচ্ছিল।

“ফুয়ং চলে গেল।”

আমারও দেখা এই ঘটনার বাকরূপ আমাকে শোনাবার প্রয়োজন ছিল বলে জানিনে। হয়তো জিম আমাকে বলেওনি। অবিশ্বাস্য খবরটা হয়তো নিজেকেই দিচ্ছিল।

জিম শুয়ে পড়ল।

“এখনো বেরুলে হয়ত ফিরিয়ে আনতে পারো।”

“পারিনে। তুমি তো ইংরেজ, মানুষের কর্মক্ষমতায় তোমার অসীম বিশ্বাস। আমি প্রাচ্য দর্শনের ছাত্র, মানুষের ক্ষমতার সামান্যতা আমি জানি।”

“বলো, ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছা নেই।”

“আবার ওই মরাল জাজমেণ্ট! না জিম, দায়িত্ব এড়ানো ছাড়া এর দ্বিতীয় নাম নেই।”

“যদি বলি দায়িত্ব এড়ানো নয়। শাস্তি এড়ানো নয়। বরং শাস্তি গ্রহণ ?”

“তাহলে বলব, ফুয়ংকে শাস্তিদানে শাস্তিগ্রহণের সকল পুণ্য শেষ হয়ে গেছে।”

“ফুয়ং কেন শাস্তি পেয়েছে, সে কথা সে নিজে ভাববে। আমি জানি এ শাস্তি কেন আমার প্রাপ্য ছিল। ফুয়ংকে ফিরিয়ে আনলে শাস্তি কমতো না, ওরও না, আমারও না। ফুয়ংকে তার নিজের ভাষায় যা বলেছিলাম, সে তার উত্তর দেয়নি। যাক, আমাদের

ত্ব'জনের বিশ বছরের মিলিত জীবন, আমি নিজ হাতে শেষ করে দিয়েছি।"

"অন্ততঃ ফুয়ুং-এর দিকে এসম্বন্ধে গুরুতর মতভেদের আশঙ্কা দেখিনে।"

"তোমার শ্লেষ আমার গায়ে লাগবে না।"

আমার ভালো লাগছিল না।

"তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকলে আমি তুঃখিত। সত্যি, এ কথা বলবার অধিকার আমার ছিল না।"

"অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর, বন্ধু। শোনো বলি, বিশ বছর আমি শুধু সুন্দর সত্য ফুয়ুং-এর সঙ্গে বাস করিনি, বাস করেছি একটা মিথ্যার সঙ্গে। তাই বলছিলাম, এ শাস্তি আমার পাওনা ছিল। তোমার তিরস্কারও।"

জিম তার পাইপ ধরালো। আমি আমার সিগারেট।

"চলো, উই উইল মেক এ নাইট অব ইট।"

"থ্যাংক য়ু, নো।"

ওই অভিযানের অর্থ আমার জানা ছিল।

"চলো। তুমি না এলেও আমি যাব। এতদিন আমার সহস্র অমিতাচারের মধ্যেও একটা নিষেধ ছিল। সে বন্ধন আজ ঘুচে গেছে।"

যে উপদেশ আম নিজে মানতে পারিনে, তা জিমকে উপযাচক হয়ে দেবার রুচি আমার ছিল না।

"তার চেয়ে বরং ফেলিসিটিকে টেলিফোন করো। আমি বাড়ি যাই।"

জিম ধৈর্য হারালে আমার বেরিয়ে আসবার একটা অজুহাত মিলত।

"মন্দ বলোনি! কিন্তু ফেলিসিটি আসবে না।"

"হঠাৎ ?"

"তাহলে শোনো বলি। কিন্তু তার আগে একটা শর্ত আছে। কথা দাও, আমার কাহিনী শেষ হলে আমার সঙ্গে বেরুবে।"

"বেশ।"

"খুব সংক্ষেপে শেষ করব। তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না, আমার বলা শেষ হবার আগে। তার পরেও না করলে অভিযোগ করব না। আগে বিশ বছর বয়সের মিথ্যাটা কবুল করে নিই। প্রাচ্যে আসবার আগে আমি বিয়ে করেছিলাম। ফুয়ংকে সে কথা কখনো বলা হয়নি। আমার স্ত্রী ক্যাথলিকের মেয়ে। সে-শাস্ত্রে ডিভোর্স নেই। আমি তাই বিশ বছর ধরে আমার অতীতের বন্দী। এই জন্যেই ফুয়ংকে বিয়ে করতে পারিনি, পিটারকে আমার নাম দিতে পারিনি। সহস্রবার অনুনয় করেছি ঈভলিনের কাছে—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী—সে শোনেনি। দিন তবু কেটে যাচ্ছিল। তারপর এ বছরের গোড়ার দিকে আমার একটা মৃদু হার্ট-এট্যাক হয়। ফুয়ংকে জানাইনি সে কথা। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমার হয়তো আর বেশী দিন বাকি নেই। তারপর ফুয়ং-এর কী হবে? পিটারের? আবার লিখলাম ঈভলিনকে, ঈভলিন সে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। ধর্মোন্মত্ত মানুষ যে এত হৃদয়হীন হতে পারে জানতাম না, অথচ ওদের কোনো অনুশোচনা নেই এ নিয়ে। ওরা নিশ্চিত যে ওরা ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে, তা তার ফলে যে যত খুশি আঘাত পাক। খৃষ্টিয়ানিটি আমি অমনি ত্যাগ করিনি। এমন সময় একদিন সিঙ্গাপুরে দেখা হোলো ফেলিসিটি ক্লার্কের সঙ্গে।"

"এণ্টার ফেলিসিটি!"

"আর কী ভয়ানক সে প্রবেশ! আমাকে ফেলিসিটি বললো, সে ঈভলিন হাটন বলে একটি মেয়েকে জানে। সন্দেহ রইল না, কে এই ঈভলিন হাটন। আমি ভাবলাম পত্রে যার কাছ থেকে সাড়া পাইনি হয়তো বান্ধবীর সূত্রে তার অভিসন্ধির হদিস মিলবে। পরপর দেখা করলাম ফেলিসিটির সঙ্গে, সে সিঙ্গাপুরে এসেছিল,

কোন এডুকেশনাল মিশন বা অমনি কিছু নিয়ে। মাত্র দিন বারোর জন্য, সারাদিন সে ব্যস্ত থাকতো কনফারেন্স নিয়ে। আমাদের দেখা হতো রাত্রে তার হোটেলে। বলাবাহুল্য আমার ফিরতে দেরী হতো।"

"এবং তা নিয়ে ফুয়ং আপত্তি করতো।"

"একান্ত স্বাভাবিক। অথচ আমার কিছু বলবার উপায় ছিল না। ভেবেছিলাম, ফেলিসিটিকে দিয়ে যদি ঈভলিনকে ডিভোর্সে রাজী করাতে পারি, তবে ফুয়ংকে বিয়ে করবো এবং সেই সঙ্গে নিরসন হবে তার সকল সন্দেহের। ফেলিসিটিকে আশ্রয় করবার কারণ ছিল। সে আশা দিয়েছিল। বলেছিল, ঈভলিন তার কথা শুনবে।"

"তারপর ?"

"তারপর, ফেলিসিটি একদিন মধ্যরাত্রির পরেও আমাকে তার হোটেলে থাকতে অনুরোধ করে।"

"দি প্লট থিকেন্স্।"

"ইট ডাস্। ওনলি, নট দি ওয়ে য়ু থিংক। যাক, সে রাত্রে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। ফেলিসিটি বললে, আমি যেন কিছু মনে না রাখি। পরদিন যেন দু'জনে বেড়াতে যাই। আমি রাজী হলুম, তখন ফেলিসিটি আমার একমাত্র ভরসা।"

"সে যুগল-ভ্রমণের বিশদ বৃত্তান্ত আমি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি।"

"আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না। তাই ফেলিসিটির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। তারই কথায় বিশ্বাস করে এখন আমি কলকাতায়, আর ফুয়ং বোধহয় সিঙ্গাপুরের পথে। হংকং গিয়ে থাকলেও অবাক হব না। ফেলিসিটিকে অপমান করবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। অথচ সেইজন্যই সে আমার উপর এমন প্রতিশোধ নেবে, একথা একবারও ভাবিনি!"

"অর্থাৎ, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার আগে ফেলিসিটি ফুয়ংকে খবর দিয়ে রেখেছিল ?"

"বীয়িং দি বিচ্ শী ইজ, অন্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনে। ফেলিসিটির পরামর্শ ছাড়া ফুয়ং-এর কলকাতা আসবার কোনো কারণ দেখিনে। নিজের সুনামের বিনিময়ে এমন প্রতিশোধ নেবার কথা কেউ ভাবতে পারে, জানতাম না। বাকি কাহিনী এখন আমার কাছে পরিষ্কার। ফুয়ংকে আমি হারিয়েছি। স্ত্রী হয়তো স্বামীর স্খলন ক্ষমা করে, রক্ষিতা করে না। ফুয়ং আর ফিরবে না।"

"ফেলিসিটি ?"

"সে কাল সকালের প্লেনে ইংল্যাণ্ড যাবে।"

"এবং দেখবে যাতে তুমি ডিভোর্স না পাও ?"

"ডিভোর্স পাবার আশা এমনিতেই খুব বেশী ছিল না। এখন আশা হচ্ছে।"

"মানে ?"

"জানো, ফেলিসিটির একটা নিষ্ঠুর রসবোধ আছে! সে হয়তো দেশে গিয়ে সত্যি আমার ডিভোর্সের ব্যবস্থা করবে, নাউ দ্যাট, দেয়ার ইজ নো ফুয়ং ফর মী টু ম্যারি! ডিভোর্স হয়ে গেলে কোনোদিন বিকালে পচা ইংরেজি কফি খেতে খেতে ফেলিসিটি আর ঈভলিন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমার অবস্থা ভাববে। ফেলিসিটি ভাববে, সিঙ্গাপুরের হোটেলে সেই গরম রাতটার কথা, বর্ষীয়সী রমণী তার অপমানের শোধ নিয়েছে। আর ঈভলিন ভাববে, পরম করুণাময় ঈশ্বর এমনি করেই পাপীকে সাজা দেন। এই দ্বিবিধ চিন্তায় দু'জনের কাছে ইংরেজি কফিও পরম পানীয় বলে মনে হবে।"

"ফুয়ংকে বলোনি কেন সব কথা ?"

"বললে কি সে বিশ্বাস করত ? তুমি করছো ?"

সময়োপযোগী প্রীতিদায়ী মিথ্যা উক্তিটা আমার মুখ দিয়ে বেরুল না।

"দেখলে তো, তুমিও করো না। আর ফুয়ং তো এগ্রাভ্‌ড পার্টি। অল দি এভিডেন্স্‌ ইজ এগেন্‌স্ট্‌ মী। ফুয়ং আমার জবানির এক বর্ণও বিশ্বাস করতো না। বরং আর সব অভিযোগের সঙ্গে আরেকটা যুক্ত হতো। আমাকে মিথ্যার দায়ে দোষী করতো!"

কবুল করব, এত বলার পরেও জিমকে আমার নিরপরাধ ও শুধু অপরের অন্যায়ের ভিকটিম বলে মনে হচ্ছিল না। যদিও বৌদ্ধ, জিম নিজেও ঠিক সে দাবী করেনি।

"বোধহয় তাই করত। স্পষ্টই বলি, তোমার বিবৃতির পরে তোমাকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায় শুধু এই রকমের একটা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর যে, তুমি যাই করো, তুমি ধর্মপ্রাণ।"

"আমি আদৌ ধর্মপ্রাণ নই, লোভের অতীত নই, ইন প্রুফ হোয়্যারঅফ আই সাজেষ্ট, লেট আস্‌ গো টু এ বেঙ্গলী গার্ল।"

"আস্‌ নয়, মী। মীনিং য়ু।"

"শকৃড্‌?"

"না।"

"পেইন্‌ড্‌?"

"না।"

"বোর্‌ড্‌?"

"বোধহয়।"

"দেন লেট মী স্পীক টু য়ু ইন য়োর টার্ম্‌স্‌।"

"শুনি।"

"ফুয়ং-এর বিরুদ্ধে এবং অংশত তোমার বিরুদ্ধে আমার নালিশ কী জানো? এ যেন এমন অবস্থা যে, তোমাকে কেউ যাত্নু করেছে এবং পরে বলছে, সে তার যাত্নুর ফলাফল জানতো না।"

"আমি তোমাকে যাত্নু করেছি বলে তো জানতাম না। ফুয়ং-এর হয়ে কিছু বলবার অধিকার অবশ্য আমার নেই।"

"সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই যে, তোমরা, তুমি বা ফুয়ং, কেউ

জানো না, প্রাচ্য আমার মতো লোকের উপর কী রকমের মোহ বিস্তার করতে পারে, যা সারা জীবনে আর কাটিয়ে ওঠা যায় না। বিশ বছর কাটলো এই দাসত্বে। এর মধ্যে মা মারা গেছেন, এক ভাই যুদ্ধে মারা গেছে, আমাদের অক্স্ফোর্ডের বাড়ি বোমায় উড়ে গেছে, সিঙ্গাপুরের য়ুরোপীয় ব্রাহ্মিনিকাল সমাজে আমি হরিজন হয়ে জীবন কাটিয়েছি, এ্যাণ্ড, আফটার অল ছ্যাট, হাউ কুড ফুয়ং থিংক, আই কুড এভার এগেন লুক অ্যাট এ হোয়াইট উওম্যান? হাউ কুড শী? হাউ কুড য়ু? আমার কাছে ব্যাপারটা এমনই অভাবনীয় যে এই নির্বোধ সন্দেহের প্রতিবাদ করতেও আমার উৎসাহ নেই। দি ঈস্ট হোল্ডস মী ইন ইটস থ্রল, অ্যাণ্ড দেন ডিনাইজ অল নলেজ অব ইট্! আই কল ছ্যাট জাস্টিস্, আই ডু!"

"আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্, জিম।"

* * *

তারপর অনেকদিন ভেবেছি জিমকে নিয়ে একটা গল্প লিখবো। কিন্তু মুস্কিল আছে। যাদের বোঝা যায় তাদের নিয়ে গল্প লেখা যায় না, সে কাজের জন্য কিঞ্চিৎ অজ্ঞতা আবশ্যক। তাছাড়া জীবিত লোকদের নিয়ে গল্প লেখার মধ্যে একটা রকমের ক্যানিবলিজম আছে। আমি ক্যানিবল নই। তাই জিমকে নিয়ে গল্প আজো লেখা হয়নি!

মণি

'কাব্যের উপেক্ষিতায়' ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবিগুরু বাল্মীকির বিরুদ্ধে অনুযোগ করেছেন, তিনি তাঁর কাব্যে উর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন, রসসৃষ্টিতে তাবৎ নায়ক-নায়িকাকে সমান সম্মান সমান অধিকার দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তবু তো উর্মিলার উল্লেখ রামায়ণে আছে। কিন্তু রামচন্দ্র আর সীতাদেবীর কি আরো বহু অনুচর সখা বান্ধবী পরিচারিকা ছিলেন না, যাদের উল্লেখ আদিকবি আদপেই করেননি? তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ, উৎসব-ব্যসন বিরহ-বেদনা মিলনানন্দ সব-কিছুই ছিল। এতৎসত্ত্বেও আদিকবি তাঁদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। তিনি তো কিছু নিছক কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি করেননি, 'নির্ভেজাল' রূপকথাতে যে রকম হয়, তিনি তো লিখেছিলেন ইতিহাস, অবশ্য রসের গামলায় চুবিয়ে নিয়ে, ব্যাটিক প্রক্রিয়ায়। হ'লই বা। তাই বলে কি শেষমেশ ঐসব অভাগাদের জ্যান্ত পোঁতা হল না?

জানিনে, আদিকবিকে এ ফরিয়াদ জানালে তিনি কি উত্তর দিতেন। যে চন্দ্রবৈদ্য শ্রীরামচন্দ্রের নখ-চুল কেটে দিত, যে শুক্লবৈদ্য মা-জননী জনকতনয়ার দুকুল-কাঁচুলী কেচে দিত তারা যদি কবি-সমীপে নিবেদন করত, তাদেরই বা তিনি ভুলে গেলেন কেন? উর্মিলার মত নিদেন তাদের নামোল্লেখ করলেই তো তারা অজরামর হয়ে যেত, তবে তিনি কি উত্তর দিতেন?

অত দূরে যাই কেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে যদি জিজ্ঞেস

করা হত, বিনয় এবং ললিতার মত দুটি অত্যুত্তম চরিত্রসৃষ্টি করার পর—হায়, বাংলায় সচ্চরিত্র কী দুর্লভ—তিনি সে দুজনকে পথমধ্যে গুমখুন করলেন কেন, তা হলে তিনি কি উত্তর দিতেন ?

আমি বাল্মীকি নই, রবীন্দ্রনাথ নই। এমন কি আমার আপন গ্রামের প্রধান লেখক নই। আমার গ্রামের শুকুরুল্লা এবং পাগলা মাধাই যেসব ভাটিয়ালি রচে গেছে, আমার রচনা তাদের সামনে লজ্জায় ঘোমটা টানে। মাধাইয়ের একটি ভাটিয়ালির ভুলে-যাওয়া অন্তরা আমি তিরিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও পুরণ করতে পারিনি। মাধাই, আমি একই পাঠশালাতে একই শ্রেণীতে পড়েছি। মাধাই ফী বচ্ছর ফেল মারতো, আমি ফার্ষ্ট হতুম।

তাই, বিশেষ করে তাই, আমি মোক্ষম মনস্থির করেছি, আমি আমার সৃজনে যাদের প্রতি স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, তাদের প্রত্যেককে জ্যান্তগোর থেকে খুঁড়ে তুলে প্রাণবন্ত করবো। অর্থাৎ অর্ধমৃত করবো। কারণ, আমি শক্তিমান লেখক নই। অদ্যাবধি বর্ণিত আমার তাবৎচরিত্রই জীবন্মৃত। অতএব এঁরাও অমৃত না হয়ে আমৃত হবেন। কিন্তু আমি তো নিষ্কৃতি পাবো আমার জন্মপাপ থেকে।

আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন সেখানকার ব্রিটিশ লিগেশনের সঙ্গে আমার কণামাত্র হৃদ্যতা হয়নি, 'দেশে-বিদেশে' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে কথা হয়ত স্মরণ করতে পারবেন। তবে লিগেশনের একজন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইনি পেশাওয়ারের খানদানী বাসিন্দা। অতিশয় খাস পাঠান। এঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে-শাদী করেননি। ইনি পেশাওয়ারের পুলিশ ইনস্পেক্টর আহমদ আলীর অগ্রজ। নাম শেখ মহবুব আলী। ব্রিটিশ লিগেশনে তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারী।

এঁর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কূটনৈতিক আমি অষ্টকুলাচল

সপ্তসমুদ্র পরিক্রমা করেও দেখতে পাইনি। আমার বিশ্বাস পাঠান-প্রকৃতি ধরে। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু এইসব সরল পাঠানদের যাঁরা সর্দার হন, যেমন মনে করুন ইপ্পাইয়ের ফকীর, ইংরিজিতে বলে ফকীর অব ইপি (Ipi), তাঁদের মত ধুরন্ধর ইহসংসারে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শেখ মহবুব আলীই বলতেন, 'পাঠানরা হয় গাড়ল, নয় ঘড়েল। মাঝখানে কিছু নেই। 'পিগমিজ অ্যাণ্ড জাইণ্টস্, নো নর্মেলস্।' অধ্যাপক বগদানফ এবং বেনওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রচুর হৃদ্যতা ছিল। বগদানফ গত হয়েছেন। বেনওয়া আছেন, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে শতায়ু দিন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই মহবুব আলীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানতে পারবেন।

মহবুব আলী বিচক্ষণ জানতেন, লিগেশনের ইংরেজ কর্তাদের সঙ্গে আমার অহি-নকুল সম্পর্ক। ওদিকে তিনি যদিও ইংরেজের সেবা করতেন, তবু ভিতরে ভিতরে ওদের তিনি দিল্-জান্ দিয়ে করতেন ঘেন্না, 'ঘৃনা' নয় ঘেন্না। এটা অবশ্য আমার নিছক অনুমান। মহবুব আলীর মত ঝাণ্ডু চানক্য, বাক্য বা আচরণে সেটা প্রকাশ করবেন, সে চিন্তাও বরাহভক্ষণসম মহাপাপ। বোধহয় প্রধানতঃ এই কারণেই তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তদুপরি আমি আহমদ আলীর বন্ধু। এবং সর্বশেষ সত্য, আমি বহু দূরদেশাগত রোগাপটকা, নির্বান্ধব দুনিয়াদারী বাবদে বেকুব বাঙালী। এমত অবস্থায় আপনি ভগবানের শরণ না নিয়ে পাঠানের শরণ নিলেই বিবেচকের কর্ম করবেন। তবে এ-কথাও বলবো, আমি তাঁর শরণ নিইনি। তিনিই আমাকে অনুজরূপে তাঁর হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

সে কথা থাক। আমি আজ তাঁর জীবনী লিখতে বসিনি। আমি লিখতে বসেছি, তাঁর স্ত্রীর পরিচারিকা সম্বন্ধে। উল্লসিত পাঠক বিরক্ত হয়ে আমার বাকি লেখাটুকু পড়বেন না, সে কথা আমি জানি, কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষম জানি, আমি যে গুণীজনের

মজলিসে দৈবেসৈবে মুখ খোলার অনুমতি পাই, তাঁদের পৌনে ষোল আনা, সহৃদয় সদাশয়জন। তাঁদের অকৃপণ হৃদয়, জন্মদাসী রাজরাণী সবাইকে আসন দিতে জানে।

আমার সঙ্গে মহবুব আলীর হৃদ্যতা হওয়ার কয়েকদিন পর আমার ভৃত্য এবং সখা আবদুর রহমান আমাকে যা জানালে তার সারাংশ এই ঃ—

মহবুব আলীর পরিবার এবং অন্য এক পরিবারের দুশমনী-লড়াই ক্ষান্ত দেবার জন্য একদা স্থিরীকৃত হয়, দুই পরিবার যেন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহবুব আলী এ-পরিবারের বড় ছেলে। তাই তাঁকেই বিয়ে করতে হল অন্য পরিবারের বড় মেয়েকে। নবদম্পতী গোড়ার দিকে সুখেই ছিলেন। ইতিমধ্যে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মহবুব আলীর এক অতি দূর চাচাতো ভাই তাঁর শ্বশুর পরিবারের ততোধিক দূর এক মামাতো ভাইকে খুন করে। ফলে মহবুব আলীর স্ত্রী পিতৃগণের আদেশানুযায়ী স্বামিগৃহ বর্জন করে পিত্রালয়ে চলে যান।

আবদুর রহমানের কাহিনী অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটেছিল বছর দশেক পূর্বে। বলতে গেলে এই অবধি মহবুব আলী অকৃতদার। অধুনা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি শীঘ্রই হিন্দুস্তান থেকে বিয়ে করে অন্য বিবি নিয়ে আসছেন।

সুহৃদ সম্বন্ধে তাঁর অপরোক্ষ আলোচনা করা অসঙ্গত, তা সে ভৃত্যের সঙ্গেই হ'ক আর পিতৃব্যের সঙ্গেই হ'ক। এই আমার বিশ্বাস! কিন্তু আবদুর রহমান যখন একবার কথা বলতে আরম্ভ করে তখন তাকে ঠেকানো অসাধ্য ব্যাপার।

শেষটায় আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, 'তোমারই এসব বলার কি দরকার? আমারই এসব জেনে কি হবে? তিনি তো আমাকে এসব কিছু বলেননি?'

আবদুর রহমান বললে, 'তিনি কেন বলেননি সেকথা আমি

কি করে জানবো? (পরে মহবুব আলীর কাছে শুনেছিলুম, দুঃখের কথা নাকি বন্ধু বন্ধুকে বলে না) তবে আপনার তো জানা উচিত।' আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হয়।

তবে রাত্রে আমার গায়ে লেপকম্বল জড়িয়ে দেবার সময় আবদুর রহমান বলেছিল, 'শেখ মহবুব আলী খান বড় ভালো লোক।'

আবদুর রহমান সার্টিফিকেট দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। এ-কথা বলে রাখা ভালো।

*　　　*　　　*

শেখ মহবুব আলীর বাসাতে আমি সময় পেলেই যেতুম। তাঁর বাসাটি লিগেশনের প্রত্যন্ত-প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলে ইংরেজের ছায়া না মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছন যেত। তিনি দফতরে থাকলে তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চাকর গফুর খান তাঁকে খবর দিতে যেত। আমি ততক্ষণে ড্রইং-রুমে বসে আগুন পোয়াতুম, আর বাবুর্চিকে সবিস্তর বয়ান দিতুম কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া আমার বাসনা।

শেখ গফুর ফিরে এসেই আমার পায়ের কাছে বসে ভাঙা ভাঙা উর্দু ফার্সী পাঞ্জাবী পশতুতে মিশিয়ে গল্প জুড়ে দিত। পাঠানদের ভিতর জাতিভেদ নেই। শেখ গফুর আর শেখ মহবুব আলী খান প্রভু ভৃত্য হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। তাই গফুর আমার সঙ্গে গল্প করাটা তার কর্তব্য বলে মনে করতো; আমি 'ভদ্রসন্তান,' তার সঙ্গে গল্প করে যে তাকে 'আপ্যায়িত' করছি, সে কথা তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হত। আবদুর রহমান এবং গফুরে যে সৌহার্দ্য ছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

সচরাচর মহবুব আলীর ড্রইং-রুম খোলাই থাকত।

আবদুর রহমান রচিত মহবুব আলীর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' শোনার কয়েকদিন পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ড্রইং-রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার হ্যাণ্ডেলের কাছে তখন

দেখি বিজলির বোতাম, কলিং বেল্। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে ভাবলুম, মহবুব আলী আবার কবে থেকে পর্দানশীন হলেন, তাঁর গৃহে মাতা নেই, অপ্রিয়বাদিনী ভার্যা পর্যন্ত নেই, তাঁর গৃহ তো অরণ্যসম। অরণ্যকে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করার কা কস্য প্রয়োজন? দিলুম বোতাম টিপে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকলুম, 'ভাই গফুর!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলুম দেখব গাট্টাগোট্টা গাল-কম্বল দাড়ি সম্বলিত বেঁটে কেলে গফুর মুহম্মদ খান। দেখি,—হকচকিয়ে গেলুম,—দেখি, দীর্ঘ এবং তম্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে লম্বা শিলওয়ার আর হাঁটু পর্য্যন্ত নেবে-আসা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথার আধেক অবধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। পেশাওয়ার কাবুলে মানুষের রঙ হয় ফর্সা, কিম্বা রোদে-পোড়া বাদামী। এ মেয়ের রঙ সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশীন বাঙালী মেয়ের হয়। তার কী তুলনা আছে?

বলতে সময় লাগল। কিন্তু প্রথম দিন তাকে দেখেছিলুম এক লহমার তরে। আমি তাকে ভালো করে দেখবার পূর্বেই সে দিয়েছিল ভিতরপানে ছুট। তখন লক্ষ্য করেছিলুম, সেও আধ লহমার তরে, গুরুগামিনী রমণীর যে যে স্থলে বিধাতা সৌন্দর্য পুঞ্জীভূত করে দেন, তম্বঙ্গীর ক্ষীণ দেহে তার কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি, বরঞ্চ বলবো, তিনি অজন্তার চিত্রকরের মত একটু যেন বাড়বাড়ি করেছেন। অথচ বয়স পনরো ষোলো হয় কি না হয়। তবে কি বিধাতা মানুষের আঁকা ছবি দেখে তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য বাড়ান?

তা সে যাকগে। তখন কি আর অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলুম, না ঐ বিষয়ে চিন্তাই করেছিলুম।

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসলুম। খানিকক্ষণ পরে মহবুব আলী এলেন। পাশে বসে ডাক দিলেন, 'ম-অ-অ-ণি'—

মণি দোরের আড়ালে দাঁড়ালে দু'জনাতে পশতু ভাষায়

কথাবার্তা হল। আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। মহবুব আলী আমাকে বললেন, 'মোটা রান্না এখনো বাবুর্চীই করে, কিন্তু মণির হাতে তৈরী নাশতা না হলে আমার বিবির চলে না।' মণি বললে, আপনি কি খেতে ভালবাসেন সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে এবং তৈরী করছে। ভালোই হ'ল। ও বড় তেজী মেয়ে। যাকে অপছন্দ করে তার রুটিতে হয়তো সেঁকো বিষ মিশিয়ে দেবে।'

দাবা খেলতে বসলুম এবং যথারীতি হারলুম। খেলার মাঝখানে মণি এসে অন্য টেবিলে নাশতা সাজালে।

সময় নিয়েছে বটে কিন্তু রেঁধেছে ভালো। মমলেটের রঙটি সর্বাঙ্গে সোণালী হলদে। এখানে বাদামী, সেখানে হলদে, ওখানে সাদা নয়। তে-কোণা পরোটা ও তৈরী করেছে যেন টিস্কয়ার সেটস্কয়ার দিয়ে। ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে কোনো জায়গায় কাঁচাও নয়।

খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, 'আধ ঘণ্টাটাক বসে যাই। সেঁকো বিষ দিয়েছে কি না তার ফলাফল দেখে যাই।' মণি দাঁড়িয়েছিল। সে মহবুব আলীর মুখের দিকে তাকালো। তিনি পশতুতে অনুবাদ করলেন। মণি 'যাঃ' কিম্বা ঐ ধরণের কিছু একটা বলে চলে গেল।

ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে তখন ঐ কাঁচা রসিকতাটুকুও করতুম না।

ইতিমধ্যে মহবুব আলী আমার বাড়িতে একবার এসেছিলেন বলে আমি তাঁর বাড়ি গেলুম দিন পনরো পরে। এবারে বাইরের বোতামে চাপ দেওয়া মাত্রই হুট করে দরজা খুলে গেল।

মণি আমাকে দেখে নিঃসঙ্কোচে পশতু ভাষায় কিচির মিচির করে উঠল। কিছুতেই থামতে চায় না। আমি একবার সামান্য সুযোগ পেয়ে বললুম 'পশতু,' তারপর বাঁ হাত উপরের দিকে তুলে ভরত নাট্যম কায়দায় পদ্ম ফুল ফোটাবার মুদ্রা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, 'ডড নং।' অর্থাৎ আমি পশতু বুঝিনে। কিন্তু কেবা

শোনে কার কথা। ভরত নাট্যমে আমি যদি হই খুচরো কারবারি মণির বেসাতি দেখলুম পাইকিরি লাটের। ডান হাত দিয়ে এক অদৃশ্য ঝাঁটা নিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা ঝাঁট দেবার মুদ্রা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে 'কুছ পরওয়া নহী।' কিন্তু শুধু মুদ্রা দিয়ে তো আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায় না। তা হলে মানুষ ভাষার সৃষ্টি না করে শুধু নেচে কুদে ও মুদ্রা দেখিয়েই শঙ্কর দর্শনের আলোচনা চালাতো, একে অন্যকে এটম বম্ বানাবার কৌশল শেখাত।

ইতিমধ্যে গফুর এসে আমার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে জানালে মহবুব আলী শহরে গেছেন, ফিরতে দেরী হবে। তবে পই পই করে বলে গেছেন, আমাকে যেন আটকে রাখা হয়। মণি ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গিয়েছে।

গফুর তার মনিবের সঙ্গে যে রকম খোলা-দিলে গল্প জমায় আমার সামনে সেই ভাবেই উজীর-নজীর কতল করতে আরম্ভ করলো। আশকথা-পাশকথা সেরে শুধালে, 'মণিকে আপনার কি রকম লাগে?'

আল্লা জানেন, মৌলা আলীর দোহাই, আমি স্নব নই। দাসী পরিচারিকা সম্বন্ধে আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার কণামাত্র আপত্তি নেই। আমার সেবক আবহুর রহমানের সঙ্গে আমার যে-ভাবের আদান-প্রদান রঙ্গ-রসিকতা চলতো, সে রকম ধারা আমি বহু 'শিক্ষিত' 'খানদানী' লোকের সঙ্গে করতে রাজী নই। কিন্তু এখানে তো ব্যাপারটা অতখানি সরল নয়। তাই একটু বিরক্তির সুরে বললুম, 'আমার লাগা-না-লাগার কি আছে?'

গফুর আমার উত্তর শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে বললে, 'এ আপনি কি বলছেন? আপনি শেখ মহবুব আলীর দোস্ত। তাঁর ইষ্টকুটুম, গোষ্ঠীপরিবারের পাঠান-পখতুনের

চেয়ে আপনাকে উনি ঢের ঢের বেশী ভালোবাসেন। আর আপনি যে ভাবে কথা বললেন, তাতে মনে হ'ল ওঁর পরিবারের জন্য আপনার যেন কোন দরদ নেই। আজ যদি মণির বিয়ের সম্বন্ধ আসে তবে কি মহবুব আলী আপনার সঙ্গে ঐ বাবদে সলা পরামর্শ না নিয়ে থাকতে পারবেন?'

আমি শুধালুম, 'এসেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললুম, থুড়ি, ভুল করলুম, এতখানি ঔৎসুক্য দেখান উচিত হয়নি। 'শাদীর পয়লা রাতে বেড়াল মারবে', এ যে দুসরা রাত খতম হবার উপক্রম।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই গফুর সোৎসাহে বললে, 'গণ্ডায় গণ্ডায়। সুবে পেশাওয়ার-কোহট, বন্নু-দেরা-ইসমাইল খান, ইস্তেক জম্মু-জলন্ধর অবধি। লিগেশনের সব কটা পাঠান চাপরাশি দফতরী, কেরানী-খাজাঞ্চী মণিকে শাদী করতে চায়।'

আমি জানতুম, পাঠানদের আপন গোষ্ঠীর ভিতর জাত বিচার নেই। কিন্তু সেটা ছিল থিয়োরেটিকল জানা, এখন দেখলুম সেটা কি রকম মারাত্মক প্র্যাকটিকল। লিগেশনের খাজাঞ্চী মেলের লোকও পরিচারিকা মণিকে বিয়ে করতে চায়!

ইতিমধ্যে মণি দু'তিনবার ঘরে এসে অগ্নিবাণ হেনে গফুরের দিকে তাকিয়েছে। ভাষা না জেনেও বুঝতে পেরেছে, ওর সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়েছে। আমি গতিক সুবিধের নয় দেখে বললুম, 'থাক থাক।'

মণি আমার জন্য এক অজানা পেশাওয়ারী কাবাব বানিয়েছে। ভারী মোলায়েম। দেখে মনে হয় কাঁচা, কিন্তু হাত দিয়ে মুখের কাছে তুলতে না তুলতেই ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। আমি আগের থেকেই হাঁ করে ছিলুম; মুখে কিছু পৌঁছল না দেখে, মণি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ভিতরের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান করলো।

মহবুব আলী এলেন। দাবার কাঁকে বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'কিস্তি সামলান। ঘোড়া উঠে, নৌকো ঘোড়ার ডবল কিস্তি।'

মহবুব আলী বললেন, 'মণিকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।

আমি বলললুম, 'হ্যাঁ, আমিও বিপদে পড়েছি। আবহুর রহমান বলছিল, এখন থেকে সবাইকে রাস্তায় দেরেশী পরে বেরুতে হবে। দর্জির দোকানে ভিড় লেগেছে। কি করি, বলুন তো।'

ততক্ষণে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যথারীতি হেরে গিয়েছি।

পূর্বেই বলেছি, মহবুব আলি চাণক্যস্য চাণক্য। তাই এটাও জানেন, কখন সাফসফা খোলাখুলি কথা কইতে হয়। বললেন, 'মণিকে বিয়ে করার জন্য সব কটা পাঠান আমার দোরে ধন্না দিচ্ছে। ওদিকে মণি বলে, সে কাউকে বিয়ে করতে চায় না। কেন? আমার বিবি বললেন, সে নাকি—'

আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ব্যস, ব্যস।'

মহবুব আলি আমার উষ্মার জন্য তৈরী ছিলেন। আমার দু'খানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দ বংশের ছেলে। আপনারা পাঠান-মোগলে বিয়ে শাদী করেন না। যদিও কুরাণ-হদিসের রায়, যে কোনো মুসলমান যে কোনো মুসলমানীকে বিয়ে করতে পারে। হক কথা। কিন্তু লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়। আজ যদি আপনি আমার বোন কিম্বা শালীকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন তবে আমি কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবো না। কিন্তু মণিকে বোঝাই কি করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে যে-কোনো ছেলের বিয়ে হয়। তা যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কি করে জানবে বলুন। বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, সে কি করে বুঝবে বলুন?'

আমি আরো বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আঃ! কী এক ষ্টর্ম-ইন-এ-টি-পট। তিলকে তাল। আপনার বাড়ির মেয়ে কাকে বিয়ে করতে চায়, না করতে চায়, তাতে আমার কি?'

মহবুব শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার তাতে কি?'

আবদুর রহমানের উপদেশ স্মরণ এল। বললুম, 'না, না, আপনি আমাকে এতখানি হৃদয়হীন মনে করবেন না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাকে যেখানে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, এবং যেস্থলে আমার হাতে কোনো সমাধান নেই, সেখানে আমি উপদেশই বা দিই কি প্রকারে?'

কাবুলে এপিডেমিক সর্দিকাশী দেখা দিল। ঝাড়া দশদিন ঘরে বন্ধ থাকতে হল। সেরে উঠে শুনি, মহবুব আলী আমার চেয়েও বে-এক্কেয়ার। ভেবেছিলুম কিছুদিন ও-পাড়া মাড়াবো না। তবু যেতে হল।

এবারে মণি দরজা খুলেই যা পশতুর তুবড়ী বাজি, বিডন্-বিশপ ফল্‌স্ চালালে, তার সামনে আমি একদম হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কুমারী পার্বতী কাম্য পতিনিন্দা শুনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিলেন, আমি উল্টো অবস্থায়। ফল কিন্তু একই।

লক্ষ্য করলুম, মণিকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছে। ফার্সীতে শুধালুম, 'সর্দি হয়েছিল নাকি?'

মণি এক বর্ণ ফার্সী বোঝে না। খলখল করে হেসে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

মহবুব এলেন লাঠিতে ভর করে। ঠাণ্ডা দেশের সর্দি, যাবার বেলা মানুষকে অর্ধমৃত করে দিয়ে যায়। বিশেষ করে যাদের চর্বি নিয়ে কারবার।

আমি জানতুম ঐ কথাই উঠবে, যদিও আশা করেছিলুম, নাও উঠতে পারে। মণির বেশ উত্তেজনা থেকে অবশ্য আমেজ করেছিলুম, আরো কিছু একটা হয়েছে।

বললেন, 'ঐ যে আমাদের ছোকরা চাপরাসী মাহমুদ জান, রাসকেল না ইডিয়ট কি বলবো। সে-ই ঘটিয়েছে কাণ্ডখানা। আপনি যখন দিন সাতেক এলেন না, তখন ঐ মাহমুদ মণিকে একটা খাসা আরব্য উপন্যাস শোনালে। রাসকেলটা গল্প বানাতে আস্ত পাঠান। সে মণিকে বললে, 'বাদশা আমানউল্লা খান সৈয়দ সায়েবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এদেশে বিয়ে না করে দামড়ার মত ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত অনুচিত। লোকনিন্দা হয়, বিশেষ করে আপনি যখন শিক্ষক।' তারপর সৈয়দ সায়েবের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেয়ে ইস্কুলে। সেখানে দু'শ মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন 'বেছে নাও'। সৈয়দ সায়েব আর কি করেন। শাহানবাদশার হুকুম। না মানলে গর্দান। আর মেয়েগুলোই বা কি কম খাপসুরত! সৈয়দ সায়েব বিয়ে করে মশগুল। তাই এ দিকে আসার ফুরসত তাঁর আর কই?'

আমি জীবনে ঐ একবারই গীতাবর্ণিত নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখাবৎ।

মহবুব আলী বললেন, 'মণি তো চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তার পর শয্যা নিল, এই ড্রইং-রুমের দরজার গোড়ায়। একটানা রোজার উপবাস। রাত্রেও খায় না—'

আমি শুধালুম, 'মণি বিশ্বাস করলে ঐ গাঁজাখুরী?

'কেন করবে না? মণি মাঝে মাঝে মোটরে করে আমার বিবির সঙ্গে শহরে যায়। পথে পড়ে মেয়ে ইস্কুল। দেখেছে, মেয়েগুলোর বরফের মত ফরসা রঙ, বেদানার মত ট্যাবাট্যাবা লাল গাল, ধনুকের মত ভুরু—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না! কিন্তু আমি তো পছন্দ করি শ্যামবর্ণ—'

এইবারে মহবুব আলীর মুখে ফুটলো মধুর হাসি। ন্যাকরা-গলা, আবদেরে আবদেরে সুরে বললেন, 'তা হলে মণিকে ডেকে সেই

সুসমাচার শুনিয়ে দি, এবং এটাও বলবো কি যে, আপনি মণিকে কাবুলী মেয়েদের চেয়ে বেশী খাপসুরত বলে মনে করেন?'

আমি তো রেগে টঙ। চিৎকার করে বললুম, 'বলুন, বলুন, বিশ্বসুদ্ধকে বলুন। আমার কি আপত্তি? মণি যখন বিশ্বাস করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তখন তো আপনার সব সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

মহবুব আলী হাসলেন, আরো মধুর হাসি। আমার গা জ্বলে গেল।

অমিয় ছানিয়া বললেন, 'ঐ তো আপনার ভুল। তাই যদি হ'ত তবে আপনাকে দেখা মাত্রই মণি হাসির বন্যা জাগালো কেন? চিৎকার করে তখন কি বলেছে, শুনেছেন? না, আপনি পশতু বোঝেন না। বলেছে 'ওঁর হাতে মেহদীর দাগ নেই, উনি বিয়ে করেননি'।

আমি চুপ। শেষটায় কাতর কণ্ঠে শুধালুম, 'মেহদীর দাগ ছাড়া কি কখনো বিয়ে হয় না?'

মহবুব আলী বললেন, 'বোঝান গিয়ে মণিকে। আপনাকে কত বার বলেছি, ও পাঠান মেয়ে, সে বোঝে পাঠানদের কায়দাকানুন। সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠান জগতে। বিশ্বভুবনের খবর সে রাখে না।'

আমি শুধালুম, 'আপনাকে গতবারে দেখেছিলুম, এ-ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা হঠাৎ কেটে গেল কি প্রকারে? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসটে আরো বেশী প্যাঁচালো হয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বললেন, 'পাঠান মেয়েরা সচরাচর বাপ-চাচার আদেশ মত নাক-কান বুঁজে বিয়ে করে। কিন্তু হঠাৎ কখনো যদি পাঠান মেয়ে কাউকে ভালোবেসে ফেলে তখন সে আগুনে হাত না দেওয়াই ভালো। ব্যাপারটার গুরুত্ব গোড়ার দিকে আমি বুঝতে পারিনি; তাই তার একটা সমাধান খুঁজছিলুম। এখন নিরাশ হয়ে অভয় মেনে বসে আছি।'

আমি আর কি বলবো? অত্যন্ত চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরলুম।

* * *

সমস্যার ফয়সালা করে দিল বাচ্চায়ে সকাও কাবুল আক্রমণ করে। আমি থাকি শহরের মাঝখানে, ব্রিটিশ লিগেশন শহরের বাইরে মাইল দেড়েকে দূরে। বাচ্চা এসেছে সেদিক থেকেই এবং থানা গেড়েছে লিগেশন আর শহরের মাঝখানে। লিগেশন আর শহর একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কয়েকদিন পরে বাচ্চা হটে গেল। তখন ব্রিটিশ প্লেন এসে বিদেশী মেয়েদের পেশাওয়ার নিয়ে যেতে লাগল। খবর পেয়েই ছুটে গেলুম আমার বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের স্ত্রীর জন্য একটা সীট জোগাড় করতে।

মহবুব আলীর কলিঙ-বেল টেপা মাত্রই এবারে দরজা খুললো না। তখন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

খানিকক্ষণ পর মহবুব আলী এলেন। মুখ বিষণ্ণ। কোন ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'কাবুল নিরাপদ স্থান নয় বলে লিগেশনের সব মেয়েদের পেশাওয়ারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন। মণিও গেছে।'

আমি বলতে চাইছিলুম, 'ভালোই হল', কিন্তু বলতে পারলুম না।

তারপর বললেন, 'আপনাকে বলে কি হবে, তবু বলি। যে কয়দিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে ক'দিন এখানে অনেক রকম গুজোব পৌঁছত, কেউ বলতো কাবুলে লুঠতরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, কেউ বলতো বিদেশীদের সব খুন করে ফেলা হয়েছে। আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ চাপরাসী থেকে ও চাপরাসীর কাছে, এ-আর্দালীর কাছ থেকে ও-আর্দালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে, আপনার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবার জন্যে।'

আমি চুপ।

তারপর যখন সে জানতে পারলে তাকেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে পেশাওয়ার চলে যেতে হবে তখন এক বিপর্যয় কাণ্ড করে তুললে। কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বললে, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না। এক রকম গায়ের জোরে তাকে প্লেনে তুলে দিতে হ'ল।

আমি কিছু বলিনি।

* * *

একদিন কাবুলে অনেক কষ্ট সওয়ার পর খবর পেলুম, এ্যারোপ্লেনে জিয়াউদ্দীন ও আমার জন্য জায়গা হয়েছে। আগের রাত্রে মহবুব আলী আমাকে গুডজর্ণি বঁভইয়াজ জানাতে এলেন। বিদায়ের সময় আমাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বললেন, 'আপনি পেশাওয়ারে পৌঁছে আমার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মণিকে খবর দেবেন। মণি এলে তার হাতে খামটা দিয়ে বলবেন, এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।'

আমি বললুম, 'আমি তো পশতু বলতে পারিনে।'

তিনি কথা ক'টি উর্দু হরফে লিখে বার তিনেক আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেন।

এ্যারোপ্লেনে বসে পরের দিন অনেক চিন্তা করেছিলুম। কি চিন্তা করেছিলুম, সে কথা দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন না।

পেশাওয়ার পৌঁছেই, গেলুম মহবুব আলীর শ্বশুর বাড়ি। বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি দুই বৃদ্ধ মুরুব্বীস্থানীয় লোক বসে আছেন। আমি মহবুব আলীর কুশল সংবাদ জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ জানালুম, মণিকে একটু খবর দিতে। ভদ্রলোকরা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বললেন, 'খবর দিচ্ছি।' এঁরা চমকে উঠলেন কেন? তবে কি এ-বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানায় আসে না? তা হলে মহবুব আলীর সেটা বোঝা উচিত ছিল।

মণি এল। আমাকে দেখে অন্দরের দোরের গড়ায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা নেই। মুরুব্বীদের দিকে একবার

তাকালে। তাঁরা তখন অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছেন। মণি মৃদু কণ্ঠে একটি শব্দ শোধালে 'সলামত?' কথাটা ফার্সী। হয়তো পশতুতেও চলে। অর্থ, 'কুশল?'

আমি ঘাড় নাড়িয়ে বললুম, 'হ্যাঁ'।

তারপর তার কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে সেই শেখা বুলিতে পশতুতে বললুম, 'এটা মহবুব আলীর স্ত্রীর হাতে দিয়ো।' মণির মুখ খুশিতে ভরে উঠল। যা বলল সে-ভাষা না জেনেও বুঝতে পারলুম, সে বলছে, 'পশতু তাহলে শিখেছেন?'

আমি দুঃখ দেখিয়ে ঘাড় নেড়ে 'না' জানালুম।

মণি ভিতরে চলে গেল।

আমি উঠি উঠি করছিলুম এমন সময় চাকর এসে বললে কিছু খেয়ে যেতে। পাঠানের বাড়িতে না খেয়ে চলে যাওয়া বড় বেয়াদবী।

মণি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়াল।

একটি কথা বললো না।

বাড়ি থেকে বেরবার সময় একবার পিছনের দিকে তাকালুম, মণিকে শেষ সেলাম জানাবার জন্য। কোথাও পেলুম না।

টাঙ্গাতে উঠে উল্টো দিকে মুখ করে বসতেই নজরে গেল দোতলার বারান্দার দিকে। দেখি মণি দাঁড়িয়ে। মাথায় ওড়না নেই। আর দু'চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, লম্বা লম্বা ধারা বয়ে।

টাঙ্গা মোড় নিল।

সেই রাত্রে দেশের ট্রেন ধরলুম।

চাচা কাহিনী

বার্লিন শহরের উলাণ্ড ষ্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান হৌস নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর এক কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার গোঁসাই ছিলেন চাচা, বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান, আর চেলারা—গোঁসাই, মুখুয্যে, সরকার, রায়, চ্যাংড়া গোলাম মৌলা ইত্যাদি।

রায় চুকচুক করে বিয়ার খাচ্ছিলেন আর গ্রাম সম্পর্কে তাঁর ভাগ্নে গোলাম মৌলা ভয়ে ভয়ে তাঁর দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছিল, পাছে তিনি বানচাল হয়ে যান। এ মামলা চাচা রোজই দেখেন, কিছু বলেন না। আজ বললেন, 'অত ডরাচ্ছিস কেন?'

মৌলা লাজুক ছেলে। মাথা নিচু করে বললে, 'ওটা খাবার কি প্রয়োজন? আপনি তো কখনো খাননি, এতদিন বার্লিনে থেকেও। মামুরই বা কি দরকার?'

চাচা বললেন, 'ওর বাপ খেত, ঠাকুদ্দা খেত, দাদামশাই খেত, মামারা খায়, এদেশে না এসেও। ও হল পাইকারী মাতাল, আর পাঁচটা হিন্দুস্থানীর মত পেঁচি মাতাল নয়। আর, আমি কখনো খাইনি তোকে কে বললে?'

আড্ডা এক সঙ্গে বল্লে, 'সে কি চাচা?'

এমন ভাবে কোরাস গাইলে, মনে হল, যেন বছরের পর বছর তারা ঐ বাক্যগুলোই মোহড়া দিয়ে আসছে।

ডান হাত গলাবন্ধ কোটের মধ্যিখান দিয়ে ঢুকিয়ে, বাঁ হাতের

তেলো চিৎ করে চাচা বললেন, 'মদকে ইংরিজিতে বলে স্পিরিট, আর স্পিরিট মানে ভূত। অর্থাৎ মদে রয়েছে ভূত। সে ভূত কখন কার ঘাড়ে চাপে তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তবে ভাগ্যিস, ও ভূত আমার ঘাড়ে মাত্র একদিনই চেপেছিল, একবারের তরে।'

গল্পের সন্ধান পেয়ে আড্ডা খুশ! আসন জমিয়ে সবাই বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

রায় বললেন, 'ভাগিনা, আরেকটা বিয়ার নিয়ে আয়।'

মৌলা অতি অনিচ্ছায় উঠে গেল। উঠবার সময় বললে, 'এই নিয়ে আঠারোটা।'

রায় শুধালেন, 'বাড়তি না কমতি?' ফিরে এলে চাচা বললেন, 'ফ্রলাইন ফন্ ব্রাখেলকে চিনিস?'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বললে, 'আহা কৈসন্ সুন্দরী,
রূপসিনী ব্লন্দিনী,
নরদিশি নন্দিনী।'

শ্রীধর মুখুয্যে বললে, 'চোপ্—।'

চাচা বললেন, 'ওর সঙ্গে প্রেম করতে যাসনি। চুমো খেতে হলে তোকে উদূখল সঙ্গে নিয়ে পেছনে পেছনে ঘুরতে হবে।'

বিয়ারের ভুড়ভুড়ির মতো রায়ের গলা শোনা গেল, 'কিংবা মই।'

গোঁসাই বললেন, 'কিংবা তুই-ই। উদূখলের উপর মই চাপিয়ে।'

শ্রীধর বললে, 'কী জ্বালা! শাস্ত্র শ্রবণে এরা বাধা দিচ্ছে কেন? চাচা আপনি চালান।'

চাচা বললেন, 'সেই ফন ব্রাখেল আমায় বড় স্নেহ করতো, তোরা জানিস। ভরগ্রীষ্মকালে একদিন এসে বললে, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, (হাবা-গঙ্গারাম) এবারে আমার জন্মদিনে তোমাকে আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতে যেতে হবে। শহরে থেকে থেকে তুমি একদম পিলা মেরে গেছ, গাঁয়ের রোদে রঙটিকে ফের একটু বাদামীর আমেজ লাগিয়ে আসবে।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ জুতোতে পালিশ লাগাতে বলছো। রোদ্দুরে না বেরিয়ে বেরিয়ে কোনো গতিকে রঙটা একটু 'ভদ্রস্থ' করে এনেছি, সেটাকে আবার নেটিভ মার্কা করবো? কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তুমি না হয় আমাকে সয়ে নিতে পারো, কিন্তু তোমার বাড়ির লোক? তোমার বাবা, কাকা?'

ব্রাখেল বললে, 'না হয় একটু বাঁদর নাচই দেখালে।'

চাচা বললেন, 'যেতেই হল। ব্রখেল আমার যা সব উপকার করেছে তার বদলে আমি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও যেতে পারি।'

মৌলা চট করে একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে নিলে।

চাচা বললেন, 'অজ পাড়াগাঁ ইষ্টিশান। প্যাসেঞ্জারে যেতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই দেখি স্বয়ং স্টেশনমাস্টার সেলাম ঠুকে সামনে হাজির। তার পিছনে ছোটবাবু, মালবাবু, অবশ্য ছ্যাশের মত খালি গায়ে আলপাকার ওপন-ব্রেস্ট্ কোট পরা নয়, টিকিট বাবু, দু চারজন তামাশা দেখনেওলা, পুরো পাক্কা প্রসেশন বললেই হয়। ঐ অজ স্টেশনে আমিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় নামলুম, আর আমিই বোধহয় শেষ।

স্টেশনমাষ্টার বললে, 'বাইরে গাড়ি তৈরী, এই দিকে আজ্ঞা হোক।'

বুঝলুম, ফন ব্রাখেলেরা শুধু বড়লোক নয়, বোধহয় এ অঞ্চলের জমিদার।

বাইরে এসে দেখি, এক প্রাচীন ফিটিং গাড়ি, কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ। কোচম্যান তার চেয়েও বুড়ো, পরনে মর্ণিং স্যুট, মাথায় চোঙ্গার মত অপ্‌রা হ্যাট, আর ইয়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁপ, এডওয়ার্ডী দাড়ি, আর চোখদুটো এবং নাকের ডগাটি সূয্যি রায়ের চোখের মত লাল, জবাকুসুম সঙ্কাশং।

কি একটা মন্ত্র পড়ে গেল, দাড়ি গোঁপের ছাকনি দিয়ে যা বেরল তার থেকে বুঝলুম, আমাকে ফিউডাল পদ্ধতিতে অভিনন্দন

জানানো হচ্ছে। এ চাপানের কি ওতোর মন্ত্র গাইতে হয় ব্রাখেল আমাকে শিখিয়ে দেয়নি, কি আর করি, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ' বলে যেতে লাগলুম আর মনে মনে ব্রাখেলকে প্রাণভরে অভিসম্পাত করলুম এ সব বিপাকের জন্য আমাকে কায়দা-কেতা শিখিয়ে দেয়নি বলে।

আমি গাড়িতে বসতেই কোচম্যান আমার হাঁটুর উপর একখানা ভারী কম্বল চেপে দুদিকে গুঁজে দিয়ে মিলিটারি কায়দায় গটগট করে কোচ বাক্সে বসলো। তারপর চাবুকটা আকাশে তুলে সার্কাসের হণ্টারওয়ালী ফিয়ারলেস্ নাদিয়ার মত ফটাফট করে মাঠের মধ্যিখান দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে স্টেশন-মাষ্টারের ফুটফুটে মেয়েটি আমার অটোগ্রাফ আর স্ন্যাপ্ দুইই তুলে নিয়েছে।

মাঠের পর ঈষৎ খাড়াই, তারপর ঘন পাইন বন ; বন থেকে বেরুতেই সামনে উঁচু পাহাড় আর তার উপর যমদূতের মত দাঁড়িয়ে এক কাস্‌ল্। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শুয়ে শুয়ে ভীষ্মদেব মেলা দুর্গের বয়ান করেছেন, এ-দুর্গ যেন সব কটা মিলিয়ে লাবড়ি-ভর্তা।

আমি ভয় পেয়ে শুধালুম, 'ঐ আকাশে চড়তে হবে ?'

কোচম্যান ঘাড় ফিরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বললে, 'ইয়াঃ মাইন হের !' দেমাকের ঠ্যালায় তার গোঁপের ডগা দুটো আরো আড়াই ইঞ্চি প্রমোশন পেয়ে গেল। তারপর ভরসা দিলে, 'এক মিনিটে পৌঁছে যাবো স্যার।' আমি মনে মনে মৌলা আলীকে স্মরণ করলুম।

এ কী বিদঘুটে ঘোড়া রে, বাবা, এতক্ষণ সমান জমিতে চলছিল আমাদের দিশী টাট্টুর মত কদম আর দুলকি চাল মিশিয়ে, এখন চড়াই পেয়ে চললো লাম্বী চালে। রাস্তাটা অজগরের মত পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে যেন কাস্‌ল্‌টার ফণা

মেলেছে, কিন্তু ফণার কথা থাক, উপস্থিত প্রতি বাঁকে গাড়ী যেন দু'চাকার উপর ভর দিয়ে মোড় নিচ্ছে।

হঠাৎ সামনে দেখি বিরাট খোলা গেট। কাঁকরের উপর দিয়ে গাড়ি এসে যেখানে দাঁড়ালো তার উপর থেকে গলা শুনে তাকিয়ে দেখি, ভিলিকিনি থেকে—

মৌলা শুধালো, 'ভিলিকিনি মানে ?'

চাচা বললেন, 'ও ; ব্যালকনি, আমাদের দেশে বলে ভিলিকিনি —সেই ভিলিকিনি থেকে ফন ব্রাখেল চেঁচিয়ে বলছে, 'যোহানেস, ওঁকে ওঁর ঘর দেখিয়ে দাও ; গুস্টাফ টেবিল সাজাচ্ছে।

তারপর আমাকে বললে, 'ডিনারের পয়লা ঘণ্টা এখুনি পড়বে, তুমি তৈরী হয়ে নাও।'

চাচা বললেন, 'পরি তো কারখানার চোঙার মত পাতলুন, আর গলাবন্ধ কোট কিন্তু একটা নেভি-ব্লু স্যুট আমি প্রথম যৌবনে হিম্মৎ সিং-এর পাল্লায় পড়ে করিয়েছিলুম, তার রঙ তখন বাদামীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এর পর কোন্ রঙ নেবে যেন মনস্থির করতে না পেরে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে আছে। হাত-মুখ ধুয়ে সেইটি পরে বেডরুম-টার ফেন্সি জিনিষপত্রগুলো তাকিয়ে দেখছি এমন সময় ব্রাখেল আমাকে নক্ করে ঘরে ঢুকলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ কি ? ডিনার জ্যাকেট পরোনি ?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ওসব আমার নেই, তুমি বেশ জানো।'

ফন ব্রাখেল বললে, 'উঁহু, সেটি হচ্ছে না। এ বাড়ীতে এ-সব ব্যাপারে বাবা জ্যাঠা দুজনাই জোর রিচুয়াল মানেন, বড্ড পিটপিটে। তোমাদের পূজোপাজা নেমাজ-টেমাজের মত সসেজ থেকে মাষ্টার্ড খসবার উপায় নেই।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'তা তুমি এক কাজ করো। দাদার কাবার্ড ভর্তি ডিনার জ্যাকেট, শার্ট, বো, তারই একপ্রস্থ পরে নাও। এটা তারই বেডরুম ; ঐ কাবার্ডে সব-কিছু পাবে।'

আমি বললুম, 'তওবা, তওবা ; তোমার দাদার জামা-কাপড় পরলে কোট মাটি পৌঁছে তোমার ডিনার গাউনের মত ট্রেল করবে।'

বললে, 'না, না, না। সবাই কি আমার মত দিক-ধেড়েঙ্গে। তুমি চটপট তৈরী হয়ে নাও, আমি চললুম।'

চাচা বললেন, 'কি আর করি, খুললুম কাবার্ড। কাতারে কাতারে কোট পাতলুন ঝুলছে, সদ্য প্রেস্‌ড, দেরাজ ভর্তি শার্ট, কলার, বো, হীরে বসানো সোনার স্লীভ-লিন্‌ক্‌স্‌, আরো কত কী!

মাণিক পীরের মেহেরবানি বলতে হবে, জুতোটি পর্যন্ত ফিট করে গেল দাস্তানার মত।

তারপর চুল ব্রাশ করতে গিয়ে আমার কেমন যেন মনে হল, এ বেশের সঙ্গে মাথার মধ্যিখানে সিঁথি জুতসই হবে না, ব্যাকব্রাশ করলেই মানাবে ভালো। আর আশ্চর্য, বিশ বছরের দু'ফাঁক করা চুল বিলকুল বেয়াড়ামী না করে এক লম্ফে তালুর উপর দিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপর চেপে বসলো, যেন আমি মায়ের গর্ভ থেকে ঐ ঢঙের চুল নিয়েই জন্মেছি। আয়নাতে চেহারা দেখে মনে হল, ঠিক জংলীর মতো তো দেখাচ্ছে না, তোরা অবিশ্যি বিশ্বাস করবি নে।'

চাচার ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই বললে, 'চাচা এ আপনার একটা মস্ত দোষ ; শুধু আত্মনিন্দা করেন। ঐ যে আপনি মহাভারতের শান্তিপর্বের কথা বললেন, সেখানেই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আত্মনিন্দার প্রচণ্ড নিন্দা করে গেছেন।'

চাচা খুশি হয়ে বললেন, 'হেঁ, হেঁ, তুই তো বললি, কিন্তু ঐ পুলিনটা ভাবে সে-ই শুধু লেডি-কিলিং লটবর। তা সে কথা যাক্ গে, ঈভনিং ড্রেসের কালা কেষ্ট সেজে আমি তো শিশ্‌ দিতে দিতে নামলুম নিচের তলায়—'

পুলিন শুধালে, 'স্যার, আপনাকে তো কখনো শিশ্‌ দিতে শুনিনি, আপনি কি আদপেই শিশ্‌ দিতে পারেন?"

চাচা বললেন, 'ঠিক শুধিয়েছিস। আর সত্যি বলতে কি আমি নিজেই জানিনে, আমি শিশ্ দিতে পারি কি না। তবে কি জানিস, হাফপ্যাণ্ট পরলে লাফ দিতে ইচ্ছা করে, জোব্বা পরলে পদ্মাসনে বসে থাকবার ইচ্ছা হয়, ঠিক তেমনি ঈভনিং ড্রেস পরলে কেমন যেন সাঁঝের ফষ্টি-নষ্টি করবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠে, না হলে আমি শিশ্ দিতে যাবো কেন? শিশ্ কি দিয়েছিলুম আমি, শিশ্ দিয়েছিল বকাটে সুটটা। তা সে কথা যাক্।'

ততক্ষণে ডিনারের শেষ ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে। আন্দাজে আন্দাজে ড্রইংরুম পেরিয়ে ঢুকলুম গিয়ে ব্যানকুয়েট হলে।

কাসলের ব্যানকুয়েট হল আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ-সাইজ হবে তার আর বিচিত্র কি এবং সিনেমার কৃপায় আজকাল প্রায় সকলেরই তার বিদ্‌ঘুটে ঢপ-ঢং দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু বাস্তবে দেখলুম ঠিক সিনেমার সঙ্গে মিললো না। আমাদের দিশী সিনেমাতে চণ্ডীদাস পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাতে লাগাতে টিনের ছাত-ওলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন, যদিও, বোতাম আর টিন এসেছে ইংরিজি আমলে। আর হলিউড যদি ব্যানকুয়েট হল দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীর, তবে আসবাবপত্র রাখে সপ্তদশ শতাব্দীর, জাস্ট টু বী অন্ দি সেফ্ সাইড।

ফন ব্রাখেলদের কাস্‌ল কোন শতাব্দীর জানিনে কিন্তু হলে ঢুকেই লক্ষ্য করলুম, মান্ধাতার আমলের টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সুখ সুবিধার সরঞ্জামও মিশে রয়েছে। তবে খাপ খেয়ে গিয়েছে দিব্য, এঁদের রুচি আছে কোনো সন্দেহ নেই। এসব অবশ্য পরে, খেতে খেতে লক্ষ্য করেছিলুম।

টেবিলের এক প্রান্তে ক্লারা ফন ব্রাখেল, অন্যপ্রান্তে যে ভদ্রলোক বসেছেন তাঁকে ঠিক ক্লারার বাপ বলে মনে হল না, অতখানি বয়স যেন ওঁর নয়।

প্রথম দর্শনেই দুজনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বাপের

হাত থেকে তো ন্যাপকিনের আংটিটা ঠং করে টেবিলের উপর পড়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম না, ভদ্রলোক হয়ত জীবনে ঐ প্রথম ইণ্ডার (ভারতীয়) দেখছেন, কালো ঈভনিং ড্রেসের ওপর কালো চেহারা—গোসাইয়ের পদাবলীতে—

'কালোর উপরে কালো'

হকচকিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয় কিন্তু ক্লারা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকালে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কি বো'টা ঠিক হেডিং মাফিক বাঁধা হয়নি, কই, আমি তো একদম রেডি-মেডের মত করে বেঁধেছি, এমন কি হাল-ফ্যাশান মাফিক তিন ডিগ্রী ট্যারচাও করে দিয়েছি। তবে কি ঈভনিং ড্রেস আর ব্যাকব্রাশ চুলে আমাকে ম্যাজিসিয়ানের মত দেখাচ্ছিল ?

সামলে নিয়ে ক্লারা ভদ্রলোককে বললে, 'পাপা, এই হচ্ছে আমার ইণ্ডিশার আফে।'

অর্থাৎ, ভারতীয় বাঁদর।

বাপও ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শেক-হ্যাণ্ড করলেন। ক্লারাকে বললেন, 'প্ ফুই —ছিঃ—ও রকম বলতে নেই।'

আমি হঠাৎ কি করে বলে ফেললুম, 'আমি যদি বাঁদর হই তবে ও জিরাফ।'

বলেই মনে হ'ল, তওবা, তওবা, প্রথম দিনেই ও-রকমধারা জ্যাঠামো করা উচিত হয়নি।

পিতা কিন্তু দেখলুম, মন্তব্যটা শুনে ভারী খুশ। বললেন, 'ডাঙ্কে —ধন্যবাদ—ক্লারাকে ঠিক শুনিয়ে দিয়েছ। আমরা তো সাহস পাইনে।'

পালিশ-আয়নার মত টেবিল, স্বচ্ছন্দে মুখ দেখা যায়। তার উপর ওলন্দাজ লেসের গোল গোল হাল্কা চাকতির উপর প্লেট, পিরিচ সাজানো। বড় প্লেটের দুদিকে সারি বাঁধা অন্ততঃ আটখানা

ছুরি, আটখানা কাঁটা, আধ ডজন নানা ঢঙের মদের গেলাস! সেরেছে! এর কোন্ ফর্ক দিয়ে মুরগী খেতে হয়, কোনটা দিয়ে রোস্ট আর কোন্‌টা দিয়েই বা সাইড্ ডিশ্ ?

আসল-খাবার পূর্বের চাট, 'অর দ্য অভ্রে'র নাম দিয়েছি আমি চাট, তখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। খুঞ্চার ছ' পদ থেকে আমি তুলেছি মাত্র দু' পদ, কিঞ্চিৎ সসেজ আর দুটি জলপাই, এমন সময় বটলার দু'হাতে গোটা চারেক বোতল নিয়ে এসে শুধালো, শেরি ? পোর্ট ? ভেরমুট ? কিম্বা উইস্কি সোডা ?

আমি এসব দ্রব্য সসম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। কিন্তু হঠাৎ কি করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'নো, বিয়ার।'

বলেই জিভ কাটলুম। আমি কি বলতে কি বললুম! একে তো আমি বিয়ার জীবনে কখনো খাইনি, তার উপরে আমি ভালো করেই জানি, বিয়ার চাষাড়ে ড্রিঙ্ক, ভদ্রলোকে যদি-বা খায় তবে গরমের দিনে, তেষ্টা মেটাবার জন্যে। অষ্টপদী ব্যানকুয়েটে বিয়ার! এ যেন বিয়ের ভোজে কালিয়ার বদলে শুঁটকি তলব করা!

ক্লারা জানতো, আমি মদ খাইনে, হয়তো বাপকে তাই আগের থেকে বলে রেখে আমার জন্যে মাফ্ চেয়ে রেখেছিল, তাই সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালে।

বাটলার কিন্তু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে এক ঢাউস বিয়ারের মগ নিয়ে এল, তার ভিতরে অনায়াসে দু'বোতল বিয়ারের জায়গা হয়।

যখন নিতান্তই এসে গিয়েছে তখন খেতে হয়। ভাবলুম, একটুখানি ঠোঁট ভেজাবো মাত্র, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে না, খেতে গিয়ে ঢক ঢক করে প্রায় আধ গেলাস সাফ করে দিলুম!

মৌলা এক বিঘত হা করে বললে, "এক ধাক্কায় এক বোতল ? মামুও তো পারবে না।'

চাচা বললেন, 'কেন শরম দিচ্ছিস, বাবা ? ওরকম ঈভনিং ড্রেস

পরে ব্যানকুয়েট হলে বসলে তোর মামাও এক ঝটকায় ছ'পিপে বিয়ার গিলে ফেলতো। বিয়ার কি আমি খেয়েছিলুম? খেয়েছিল ঐ শালার ড্রেস।

গোঁসাই মর্মাহত হয়ে বললে, "চাচা।"

চাচা বললেন, 'অপরাধ নিস্‌নি গোঁসাই, ভাষা বাবদে আমি মাঝে মাঝে এট্টুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে যাই। জানিস তো আমার জীবনের পয়লা গুরু ছিলেন এক ভশ্চায, তিনি শ' কার ব' কার ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। তা সে কথা থাক।'

তখনো খেয়েছি মাত্র আড়াই চাক্তি সসেজ আর আধখানা জলপাই, পেট পদ্মার বালুচর। সেই শুধু-পেটে বিয়ার ছ'মিনিট জিরিয়েই চচ্চড় করে চড়ে উঠলো মাথার ব্রহ্মরন্ধ্রে।

এমন সময় হের ফন্ ব্রাখেল জিজ্ঞেস করলেন, 'বার্লিনে কিরকম পড়াশোনা হচ্ছে?'

বুঝলুম, এ হচ্ছে ভদ্রতার প্রশ্ন, এর উত্তরে বিশেষ কিছু বলতে হয় না, হুঁ, হুঁ, করে গেলেই চলে কিন্তু আমি বলললুম, 'পড়াশোনা? তার আমি কি জানি? সমস্ত দিন, সমস্ত রাত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, তো কাটে হৈ হৈ করে ইয়ার-বক্‌শীদের সঙ্গে।'

বলেই অবাক হয়ে গেলুম। আমার তো দিনের দশ ঘণ্টা কাটে ষ্টাটস্ বিবলিওটেকে, ষ্টেট লাইব্রেরিতে, ক্লারারও সে খবর বেশ জানা আছে। ব্যাপার কি? সেই গল্পটা তোদের বলেছি?—পিপের ছ্যাঁদা দিয়ে হুইস্কি বেরচ্ছিল, ইঁদুর চুক চুক করে খেয়ে তার হয়ে গিয়েছে নেশা। লাফ দিয়ে পিপের উপরে উঠে আস্তিন গুটিয়ে বলছে, 'ঐ ড্যাম ক্যাট্‌টা গেল কোথা? ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও, তার সঙ্গে আমি লড়বো।'

কিন্তু এত সাত-তাড়াতাড়ি কি নেশা চড়ে?

ইতিমধ্যে আপন অজানাতে বিয়ারে আবার এক লম্বা চুমুক দিয়ে বসে আছি।

করে করে তিনচার পদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে যখন রোষ্ট টার্কীতে পৌছেছি, তখন দেখি অতি ধোপত্থরস্ত ঈভনিং ড্রেস পরা আর এক ভদ্রলোক টেবিলের ওদিকে আমার মুখোমুখি হয়ে দাড়ালেন। ক্লারা তাঁকে বললে, 'জ্যাঠামশাই, এই আমাদের ইণ্ডিয়ান।' বড় নার্ভাস ধরণের লোক। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আর বার বার বলছেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি শুধু ইয়ে—'তারপর আমার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি শুধু রোষ্ট আর পুডিং খাই বলে একটু দেরীতে আসি।'

তারপর আমি কি বকর বকর করেছিলুম আমার স্পষ্ট মনে নেই। সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিয়ারের পর বিয়ার, কখনো বা বেশ উঁচু গলায় বলে উঠি, 'গুষ্টাফ, আরও বিয়ার নিয়ে এসো।'

এ কী অভদ্রতা! কিন্তু কারো মুখে এতটুকু চিত্ত বৈকল্যের লক্ষণ দেখতে পেলুম না, কিংবা হয়ত লক্ষ্য করিনি। আর ভাবছি, ডিনার শেষ হলে বাঁচি।

শেষ হলও। আমরা ড্রইংরুমে গিয়ে বসলুম। কফি, লিকার সিগার এল। আমি অভদ্রতার চূড়ান্তে পৌছে বললুম, 'নো লিকার, বিয়ার প্লীজ!'

বাবা হেসে বললেন, 'আমাদের বিয়ার তোমার ভাল লাগাতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু একটু বিলিয়ার্ড খেললে হয় না? তুমি খেলো?'

বললুম 'আলবৎ!' অথচ আমি জীবনে বিলিয়ার্ড খেলেছি মাত্র ছ'দিন, কলকাতার ওয়াই-এম-সি-এতে। এখানকার বিলিয়ার্ড টেবিলে আবার পকেট থাকে না, এতে খেলা অনেক বেশী শক্ত।

জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে বললেন 'গুড নাইট, তোমরা খেলোগে।' ক্লারাও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে 'গুড নাইট' বললে।

খুব নিচু ছাতওয়ালা, প্রায় মাটির নিচে বিরাট জলসাঘর, তারই এক প্রান্তে বিলিয়ার্ড টেবিল। দেয়ালের গায়ে গায়ে সারি সারি বিয়ারের পিপে। এত বিয়ার খায় কে? এরা তো কেউ বিয়ার খায় না দেখলুম।

ইতিমধ্যে লিকারের বদলে ফের শ্যাম্পেন উপস্থিত। আমি বললুম 'নো শ্যাম্পেন।' আবার চললো বিয়ার।

মার্কার কিউ এনে দিলে। আমি সেটা হাতে নিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললুম, 'এ আবার কি কিউ দিলে?'

মার্কারের মুখে কোনো অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠলো না। বরঞ্চ যেন খুশি হয়েই আলমারি খুলে একটি পুরনো কিউ এনে দিলে। আমি পাকা খেলোয়াড়ীর মত সেটা হাতে ব্যালান্স্ করে বললুম, 'এইটেই তো, বাবা, বেশ, তবে ঐ পচা মাল পাচার করতে গিয়েছিলে কেন?'

আমার বেয়াদবী তখন চূড়া ছেড়ে আকাশে উঠে ঢলাঢলি আরম্ভ করে দিয়েছে। অবশ্য তখনো ঠিক ঠিক ঠাহর হয়নি, মালুম হয়েছিল অনেক পরে।

গ্রামের একঘেয়ে জীবনের ঝানু খেলোয়াড়কে আমি হারাবো এ আশা অবশ্যি আমি করিনি কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখলুম, খুব যে খারাপ খেলছি তা নয়, তবে আমার প্রত্যাশার চেয়ে ঢের ভালো। আর প্রতিবারেই আমি লীড পেয়ে যাচ্ছিলুম অতি খাসা, স্বপ্নের বিলিয়ার্ডেও মানুষ ও রকম লীড পায় না।

রাত কটা অবধি খেলা চলেছিল বলতে পারবো না। আমি তখন তিনটে বলের বদলে কখনো ছ'টা কখনো ন'টা দেখছি, কিন্তু খেলে যাচ্ছি ঠিকই, খুব সম্ভব ভালো লীডের লাকে।

হের ফন ব্রাখেল শেষটায় না বলে থাকতে পারলেন না, 'তোমার লাক বড় ভালো।'

অত্যন্ত বেকসুর মন্তব্য। আমি কিন্তু চটে গিয়ে বেশ চড়া গলায়

বললুম 'লাক না কচুর ডিম। নাচতে না জানলে শহর বাঁকা। আই লাইক ছ্যাট্!'

ব্রাখেল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, আমি অষ্টমে উঠে আরো কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। ওদিকে দেখি মার্কার ব্যাটা মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি আরো চটে গিয়ে হুঙ্কার দিলুম, 'তোমার মুলোর দোকান বন্ধ করো, এখন রাত সাড়ে তেরোটায় কেউ মুলো কিনতে আসবে না'। অথচ বেচারী বুড়ো থুত্থুড়ে, সব কটা দাঁত জগন্নাথ দেবতাকে দিয়ে এসেছে।

চিৎকার চেল্লাচেল্লির মধ্যিখানে হঠাৎ দেখি সামনে জ্যাঠামশাই, পরনে তখনো সেই পরিপাটি ঈভনিং ড্রেস।

আবার সেই নার্ভাস স্বরে বললেন, 'সরি সরি, তোমরা কিছু মনে করো না, আমি শব্দ শুনে এলুম।' তারপর বাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই বড় ঝগড়াটে, ভল্‌ফ্‌গাঙ, নিত্য নিত্য এর সঙ্গে ঝগড়া করিস।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তার চেয়ে বরঞ্চ একটু তাস খেললে হয় না? আমার ঘুম হচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'হুঁ হুঁ হুঁ!'

তাসের টেবিল এল।

আমি স্কাট খেলেছি বিলিয়ার্ডের চেয়েও কম।

জ্যাঠা বললেন, 'কি স্টেক?'

বাপ বললেন, 'নিত্যিকার।'

'নিত্যিকার' বলতে কি বোঝালো জানিনে। ওদিকে আমার পকেটে তো ছুঁচো ডিগবাজী খেলছে। জ্যাঠা হিসেব করে বললেন, 'হানস্ পসেরো মার্ক ভল্‌ফ্‌গাঙ, তুই।'

আপনার থেকে আমার বাঁ হাত কোটের ভিতরকার পকেটের দিকে রওনা হল। তখনই মনে পড়লো, এ কোট তো ক্লারার দাদার। আমার মনিব্যাগ তো পড়ে আছে আমার কোটে, উপরের তলায়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে হাত গিয়ে ঠেকলো এক

তাড়া করকরে নোটে। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তাঁহার কৃপায় টাকা গজায়, এই টাকা দিয়েই আজকের ফাঁড়া কাটাই, পরের কথা পরে হবে। ক্লারাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আর নিজের মনিব্যাগে রেস্ত আছেই বা কি? দশ মার্ক হয় কি না হয়।

এদিকে রেস্ত নেই, ওদিকে খেলার নেশাও চেপেছে। পরের বাজীতে আবার হারলুম, এবারে গেল আরো কুড়ি মার্ক, তারপর, পঞ্চাশ, তারপর কত তার আর আমার হিসেব নেই। নোটের তাড়া প্রায় শেষ হতে চললো। আমি যুধিষ্ঠির নই, অর্থাৎ কোন রমণীর উপর টুয়েন্টি পার্সেণ্ট অধিকারও আমার নেই, না হলে তখন সে রেস্তও ভাঙাতে হতো, এমন সময় আস্তে আস্তে আমার ভাগ্য ফিরতে লাগলো। দশ কুড়ি করে করে সব মার্ক তোলা হয়ে গেল, তারপর প্রায় আরো শ'দুই মার্ক জিতে গেলুম।

ওদিকে মদ চলেছে পাইকারি হিসেবে আর জ্যাঠামশাই দেখি হারার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশী নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন। আমি তো শেষটায় না থাকতে পেরে খলখল করে হেসে উঠলুম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারিনে। গলা দিয়ে এক ঝলক বিয়ার বেরিয়ে এল, কোন গতিকে সেটা রুমাল দিয়ে সামলালুম। কিন্তু হাসি আর থামাতে পারিনে। বুঝলুম, এরেই কয় নেশা।

জ্যাঠামশাই নার্ভাস সুরে বললেন, 'হেঁ, হেঁ, এটা যেন, কেমন যেন,—হেঁ, হেঁ, তোমার লাক্—হেঁ, হেঁ—নইলে আমি খেলাতে—'

আবার লাক্! এক মুহূর্তে আমার হাসি থেমে গিয়ে হল বেজায় রাগ। বিলিয়ার্ডের বেলায়ও আমাকে শুনতে হয়েছিল ঐ গড্ড্যাম লাকের দোহাই।

টং হয়ে এক ঝটকায় টেবিলের তাস ছিটকে ফেলে বললুম, 'তার মানে? আপনারা আমাকে কি পেয়েছেন? ইউ এ্যাণ্ড ইয়োর ড্যাম্ লাক্, ড্যাম্, ড্যাম্—'

বাপ জ্যাঠা কি বলে আমায় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন আমার সেদিকে খেয়াল নেই। কতক্ষণ চলেছিল তাও বলতে পারবো না, আমার গলা পর্দার পর পর্দা চড়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে ছুনিয়ার যত কটূ কাটব্য।

এমন সময় দেখি ক্লারা।

কোথায় না আমি তখন হুঁশে ফিরবো আমি তখন সপ্তমে না, একেবারে সেঞ্চুরির নেশায়। শেষটায় বোধ হয়, 'ছোট লোক,' 'মীন', এই সব অশ্রাব্য শব্দও ব্যবহার করেছিলুম।

ক্লারা আমার কাঁধে হাত দিয়ে নিয়ে চললো দরজার দিকে। অনুনয় করে বললে, 'অত চটছো কেন, ওঁদের সঙ্গে না খেললেই হয়, ওঁরা ঐ রকমই করে থাকেন।'

বেরবার সময় পর্যন্ত শুনি ওঁরা বলছেন, 'সরি, সরি, প্লীজ, প্লীজ। আমাদের দোষ হয়েছে।'

'তবু আমার রাগ পড়ে না।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। রায় বললেন, 'ঢের ঢের মদ খেয়েছি, ঢের ঢের মাতলামো দেখেছি, কিন্তু এরকম বিদঘুটে নেশার কথা কখনো শুনিনি।'

চাচা বললেন, 'যা বলেছো! তাই আমি রাগ ঝাড়তে ঝাড়তে গেলুম শোবার ঘরে। ইভনিং কোট, পাতলুন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কিন্তু ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে, বিয়ারের মগও হাতের কাছে নেই।

বালিশে মাথা দিতে না দিতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সমস্ত সন্ধ্যা আর রাতভোর কি ছুঁচোমিটাই না করেছি। ছি, ছি, ক্লারার বাপ জ্যাঠামশায়ের সামনে কি ইতরোমোই না করে গেলুম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

আর এদেশে সবাই ভাবে ইণ্ডিয়ার লোক কতই না বিনয়ী, কতই না নম্র।

যতই ভাবতে লাগলুম, মাথা ততই গরম হতে লাগলো। শেষটায় মনে হল কাল সকালে, আজ সকালেই বলা ভালো, কারণ ভোরের আলো তখন জানালা দিয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে, এঁদের আমি মুখ দেখাবো কি করে? জানি, মাতালকে মানুষ অনেকখানি মাফ করে দেয় কিন্তু এ যে একেবারে চামারের মাতলামো।

তাহলে পালাই।

অতি ধীরে ধীরে কোনো প্রকারের শব্দটি না করে, সুটকেসটি ঐখানেই ফেলে গাছের আড়ালে আড়ালে কাসল থেকে বেরিয়ে ষ্টেশন পানে দে ছুট। মাইলখানেক এসে ফিরে তাকালুম; নাঃ কেউ পিছু নেয়নি।

চোরের মত গাড়ীতে ঢুকে সোজা বার্লিন।

মৌলা বললে, 'শুনলেন, মামা?'

চাচা বললেন, 'আরে শোনোই না শেষ অবধি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তখনো ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি, এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা! হায়, হায়, আমি ল্যাণ্ডলেডিকে একদম বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সবাইকে যেন বলে, আমি মরে গিয়েছি, কিম্বা পাগলা গারদে বন্ধ হয়ে আছি, কিম্বা ঐ ধরনের কিছু একটা।

শেষটায় মর মর হয়ে ক্লারার কাছে মাতলামোর জন্য মাফ চাইলুম।

ক্লারা বললে, 'অত লজ্জা পাচ্ছ কেন? ওতো মাতলামো না, পাগলামো। কিম্বা অন্য কিছু, তুমি সব কিছু বুঝতে পারোনি, আমরাও যে পেরেছি তা নয়।'

তুমি যখন দাদার সুট পরে ডিনারে এলে তখনই তোমার সঙ্গে

কোথায় যেন দাদার সাদৃশ্য দেখে বাবা আর আমি দু'জনাই আশ্চর্য হয়ে গেলুম, বিশেষ করে ব্যাকব্রাশ করা চুল আর একটুখানি ট্যারচা করে বাঁধা বো দেখে। তারপর তুমি জোর গলায় চাইলে বিয়ার, দাদাও বিয়ার ভিন্ন অন্য কোনো মদ খেত না, তুমি আরম্ভ করলে দাদারই মত বকতে, 'লেখা পড়ার সময় কোথায়? আমি তো করি হৈ হৈ'—আমি জানতুম একদম বাজে কথা; কিন্তু দাদা হৈ হৈ করতো আর বলতেও কসুর করতো না।

শুধু তাই নয়। দাদাও ডিনারের পর বাবার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলতো এবং শেষটায় দুজনাতে ঝগড়া হত। জ্যাঠামশাই তখন নেমে এসে ওদের সঙ্গে তাস খেলা আরম্ভ করতেন এবং আবার হত ঝগড়া। অথচ তিনজনাতে ভালোবাসা ছিল অগাধ।

তোমাকে আর সব বলার দরকার নেই; তুমি যে ঘরে উঠেছিলে ঐ ঘরেই একদিন দাদা আত্মহত্যা করে।

কিন্তু আসলে যে কারণে তোমার কাছে এলুম, তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; বাবা, জ্যাঠামশাই আমাকে বলতে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তোমার ব্যবহারে কিছুমাত্র আশ্চর্য কিম্বা দুঃখিত হননি।'

চাচা থামলেন।

রায় বললেন, 'চাচা আপনি ঠিকই বলেছিলেন, শিশ্ দিয়েছিল স্যুটটাই, বিয়ারও ও-ই খেয়েছিল।'

চাচা বললেন, 'হক কথা। মদ মানে স্পিরিট, স্পিরিট মানে ভূত, তাই স্পিরিট স্পিরিট খেয়েছিল।

বাঁশী

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই।

তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজত্ব, মহারাণীর সরকারই যখন চলে গেল তখন এঁরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল, কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

খুলে কই।

তখন আশ্রমের গাছ-পালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকিসারি। ব্যস্। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কম্প্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন,. দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দী ছাড়িয়ে—খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা—চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সুয্যিঠাকুরের টিকিটি বেরুনমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরোটার সময় চাঁদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম—'চাঁদ উঠেছিল গগনে'। যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম, জাম, কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই, তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কালো, নীল, হলদে ইয়া-ইয়া ফুলের গাছ। এখন

আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মতো। সেখানে পাঁচতলা এমারৎ সূয্যিচন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়।

ঐ দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভালো ছেলে তারা তাকাতো বইয়ের দিকে আর আমার মত গবেটরা একহাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দী বদ্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকতো সেই সুদূর রাটের পানে—তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাই, মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তাঁরা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর নরৌ নরাঃ, গজ গজৌ গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে কিন্তু আমাদের দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো, কিন্তু তাঁরা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপ-মা-খ্যাদানো ছেলে, এসেছি এখানে, এখন থেকে খেদিয়ে দিলে, হয় যাবো ফাঁসী নয় যাবো জেলে।

এই দূরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কি প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারিনি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাঁঝে, তারপর অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে একই জায়গায় সাতশ' বার চক্কর খেয়ে, পেয়েছে অক্কা। বুড়ো মাঝিরা বলে, পেয়েছিল ভূতে। সেকথা পরে হবে।

আমি শান্তিনিকেতনে আসি ১৯২১ সালে। গাঁইয়া লোক। এখানে এসে কেউ বা নাচে ভরতনৃত্যম্, কেউ বা গায় জয়জয়ন্তী, কেউ বা লেখে মধুমালতী ছন্দে কবিতা, কেউ বা গড়ে নব নটরাজ, কেউ বা করে বাতিক, লেদার-ওয়ার্ক—ফ্রেস্কো, স্টুক্কো, উড-ওয়ার্ক, এচিং, ড্রাই-পয়েণ্ট, মেদজো-টিন্ট্ আরো কত কি। এক কথায় সবাই শিল্পী, সবাই কলাবৎ।

আমারও বাসনা গেল—শিল্পী হব। আর্টিষ্ট হব। ওদিকে তো লেখাপড়ায় ডডনং, কাজেই যদি শিল্পীদের গোয়ালে কোনোগতিকে ভিড়ে যেতে পারি তবে সমাজে আমাকে বেকার-বাউণ্ডুলে না বলে, বলবে শিল্পী, কলাবৎ, আর্‌তিস্‌ৎ।

অথচ আমার বাপ পিতম'র চোদ্দপুরুষ, কেউ কখনো গাওনা-বাজনার ছায়া মাড়ানো দূরে থাক, দূর থেকে ঝঙ্কার শুনলেই রামদা নিয়ে গাওয়াইয়ার দিকে হানা দিয়েছেন। আমরা কট্টর মুসলমান। কুরানে না হোক আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে গাওনা-বাজনা বারণ, বাঁদর-গুলোর ডুগডুগি শুনলে আমাদের প্রাচিত্তির করতে হয়। আমার ঠাকুদ্দাদার বাবা নাকি সেতারের তার দিয়ে সেতারীকে ফাঁসী দিয়ে শহীদ হয়েছিলেন।

কাজেই প্রথমদিন ব্যালাতে ছড় টানা মাত্রই আশ্রমময় উঠলো পরিত্রাহি অট্টরব। কেউ শুধালে, গরু জবাই করছে কে, কেউ ছুটলে গুরুদেবের কাছে হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মামদো ভূতের উপদ্রব থামাবার জন্য অনুরোধ করতে। গুরুদেব পড়লেন বিপদে। তাঁর মনে পড়ল আপন ছেলেবেলাকার কাহিনী—তাঁর পিতৃদেব তাঁর প্রথম কবিতা শুনে কি রকম বাঁকা হাসি চেপে ধরেছিলেন। তাই তিনি সে রাত্রে কবিতা লিখলেন,

'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাবো কাহার হাতে?'

কার হাতে আর দেবেন? দিলেন আমারই হাতে। সবাই বুঝিয়ে বললে, 'ভাই ব্যালাটা ক্ষান্ত দাও। বাঁশীই বাজাও; কিন্তু দোহাই আশ্রমদেবতার, আশ্রমের বাইরেই রেওয়াজটা করো।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বাঁশী হাতে নিয়ে গেলুম সাঁওতাল গাঁয়ের দিকে। পশ্চিমাস্য হয়ে, অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধরলুম তোড়ি।

সাঁওতাল গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মেলা এন্‌কোর, সাধু সাধু রব কাড়লে।

সুদূর দিকপ্রান্তের দিকে, অস্তমান সূর্যের পানে তাকিয়ে আমার মাথায় তখন চাপলো সেই বাই—যেটা পূর্বেই আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি—হোথায় যেথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আমাকে সেখানে যেতে হবে।

নেমে পড়লুম খোয়াইয়ে।

গোধূলির আলো ম্লান হয়ে আসছে। তারই লালিমা খোয়াইয়ের গেরুয়াকে কিরকম যেন মরুন রঙ মাখিয়ে দিচ্ছে। চতুর্দিকে কিরকম যেন একটা ক্লান্তি আর অবসাদ। আমি সুদূরের নেশায় এগিয়ে চললুম।

হঠাৎ ঝুম্ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথমটার বিপদটা বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম মিনিট পাঁচেক পরে। অন্ধকারে হোঁচট্ খেয়ে, উঁচু ঢিপি থেকে গড়গড়িয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে নিচে পড়ে, হঠাৎ উঁচু ঢিপির সঙ্গে আচমকা নাকের ধাক্কা লেগে, কখনো বা কারো অদৃশ্য পায়ে বেমক্কা ল্যাং-খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে।

উঠি আর পড়ি, পড়ি আর উঠি।

দশ মিনিটে সাঁওতাল গাঁয়ে ফেরার কথা। পনেরো, পঁচিশ মিনিট, আধঘণ্টাটাক হয়ে গেল, গাঁয়ের কোনো পাত্তাই নেই।

ততক্ষণে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছি। জাহান্নমে যাকগে আকাশের সীমানা-ফিমানা, এখন আশ্রমের ছেলে আশ্রমে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় আশ্রম, কোথায় সাঁওতাল গ্রাম। একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি, না কোনো একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি তাই আল্লার মালুম।

এমন সময় কানের কাছে শুনি—

অদ্ভুত, তীক্ষ্ণ কেমন যেন এক আর্তরব। একটানা নয়, থেমে থেমে। কেমন যেন—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফীঁ-ঈ-ঈ-ৎ!

ভয়ে ছুট লাগাবার চেষ্টা করলুম। সেই ফিঁৎ ফিঁৎ যেন কলরব করে উঠে আরো জোরে চেঁচাতে লাগল—ফীঁৎ, ফীঁৎ, ফীঁৎ!

ইয়া আল্লা, ইয়া পয়গম্বর, ইয়া মৌলা আলীর মুরশীদ। বাঁচাও বাবারা, এ কি ভূত না প্রেত না ডাইনী।

হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলুম গড়গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূতুড়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপার কি!

আস্তে আস্তে ফের রওয়ানা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই শব্দ—প্রথমে ক্ষীণ, আমি যত জোরে চলতে থাকি শব্দটাও সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে। প্রথমটায় আস্তে আস্তে—ফিঁৎ, ফিঁৎ, ফিঁৎ। আমি যত জোর চলতে আরম্ভ করি শব্দটাও দ্রুততর হতে থাকে—ফিঁৎ ফিঁৎ ফিঁৎ।

আর সে কি প্রাণঘাতী, জিগরের খুন জমানেওলা শব্দ!

যেন কোন কঙ্কালের নাকের ভিতর দিয়ে আসছে দীর্ঘনিশ্বাস—কখনো ধীরে ধীরে আর কখনো বা দ্রুতগতিতে। একদম আমার সঙ্গে কদম কদম বাঢ়হায়ে যাচ্ছে, আমার কানের কাছে যেন সেঁটে গিয়ে, লম্বা লম্বা হাতের আঙুল দিয়ে কানের পর্দাটা ছিঁড়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুরুদেবের কঙ্কাল গল্পটা। কিন্তু গুরুদেব মহর্ষির সন্তান; তিনি ভয় পাননি। বেশ জমজমাট করে খোশগল্প করেছিলেন কঙ্কাল আর ভূতের সঙ্গে। আমি পাপী—নেমাজ-রোজা নিত্যি নিত্যি কামাই দিই।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আমার গলার টুটি চেপে ধরল।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দেখি—যেন আমার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ তারা ফুটে উঠছে। কিন্তু হলদে রঙের। প্যোর কোলামন্‌স্ মাস্টার্ড।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, বলতে পারবো না।

যখন হুঁশ হল তখন গায়ে লাগলো পুবের বাতাস। তারই উল্টো দিকে চলতে আরম্ভ করলুম। ঐ রকম যদি চলতে থাকি,

তবে একদিন না একদিন আশ্রম, ভুবনডাঙা, কিম্বা রেললাইনে পৌঁছবই পৌঁছব।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ জোরে সেই—ফিঁং ফিঁং ফিঁং।

কিন্তু এবারে সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢিপিতে উঠতেই দেখি—উত্তরায়ণ। তারই বারান্দায় গুরুদেবের সৌম্য মূর্তি। টেবিল ল্যাম্পের পাশে বসে মিশ্রজীর সঙ্গে গল্প করছেন।

আমি চিৎকার করে উঠলুম—

ওয়া গুরুজীকী ফতে।

গুরুর জয়, গুরুদেবের জয়।

তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি।

কিন্তু ওয়া গুরুজীকী ফতে—বেরিয়েছিল---ওবা গরজীকী ফত—হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে, চাপা সুরে।

ততক্ষণে ধড়ে জান ফিরে এসেছে।

শব্দটা তবে কিসের ছিল?

বাঁশীর। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে হাওয়া ঢুকে ফিঁং ফিঁং করেছিল। জোরে চললে হাত ঘন ঘন দোলা খেয়েছে, ফিঁং ফিঁংও জোরে বেজেছে। আস্তে চললে, আস্তে আস্তে।

বাঁশীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। শেষবারের মত ফিঁং করে কাতর আর্তনাদ ছেড়ে সে নীরব হল।

আমি আর কলাবৎ হবার চেষ্টা করিনি।

গুরুদেব যখন গেয়েছেন—

বাঁশী, তোমায় দিয়ে যাবো কাহার হাতে?

তখন আমার কথা ভাবেননি।

ইংরেজী রসিকতা

ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি যে নিরপেক্ষ তা সুবিদিত। এই নীতির সমর্থকদের, অর্থাৎ আমাদের, পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীর নিরপেক্ষ থাকা প্রায় অসম্ভব। শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ বিদেশী এসেছে এদেশে। নিরপেক্ষ থাকেনি কেউ। অনেকে এসে ভারতের প্রেমে পড়েছে। হিমালয় দেখে অভিভূত হয়েছে। গ্রীষ্মের রাত্রে গ্রামের গভীর ঝোপের মধ্যে জোনাকির খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছে। অন্তহীন দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্ত জীবনদর্শনের নিষ্প্রতিবাদ অভিব্যক্তি দেখে অবাক হয়েছে। অনেকে এখানে থেকে গেছে। গৃহী হয়েছে বা সন্ন্যাসী হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অবিশ্বাস্য পরিপাকশক্তির কাছে তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। এই বিশাল ভারতে তারা নিজেদের হারিয়ে নিজেদের পেয়েছে।

আরেক জাতের বিদেশী এসেছে, যারা এই ভারতের সাগরতীরে পদার্পণ করা মাত্র একে বিদেশ বলে জেনেছে। এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা করেনি। কেউ কেউ বিশ ত্রিশ বছর থেকে গেছে শুধু অর্থার্জনের আশায়। ভারতকে জানেনি, জানবার আগ্রহই কখনো হয়নি। অফিসে বা কারখানায় শ্রমিক বা কর্মচারীদের মনে করেছে চলন্ত মেশিন বলে, জীবন্ত মানুষ বলে নয়। শেষে যখন ভারত ছেড়ে গেছে তখন একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়েনি এদেশের জন্য, এদেশের কারো জন্য। বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠা মাত্র মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে দেশের ছবি, স্কটল্যাণ্ডের কোনো গ্রাম

বা ম্যাঞ্চেস্টারের কোনো গীর্জা। গত ত্রিশ বছর? দীর্ঘ একটা দুঃস্বপ্ন।

টম জনসন—যে সেদিন দমদম থেকে প্লেনে করে চিরদিনের জন্য ভারত থেকে এবং আরেকজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে—এদেশে এসেছিল একটা পুরনো ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসে সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। দ্বিতীয় যে শ্রেণীর বিদেশীর উল্লেখ করেছি তাদের দেখে টম শিউরে উঠেছিল। শুধু টাকার জন্য একটা দেশে বাস করব, কাজ করব, ত্রিশ বছর ধরে? অথচ একদিনের জন্যও দেশটাকে আপন বলে ভাবব না? দরকার নেই তার টাকায়। তার দেশে এখন নেই বেকার সমস্যা। সে ফিরে যাবে। ভারতবর্ষের দোষ নয়, তার দোষ নয়। দু'জনে মিলল না। এই সিদ্ধান্তে টম পৌঁছোল কলকাতায় আসবার তিন মাস পরে।

অথচ কন্ট্রাক্ট তার তিন বছরের।

একদিন সুযোগ বুঝে টম কথাটা তুলল তার বড়ো সাহেব সার কেনেথ উইলিয়ামসের সঙ্গে। সার কেনেথ কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, "ও কিছু নয়। তোমার বয়সে একটু হোমসিক হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দেখবে দু'দিনে সয়ে যাবে। তখন তুমিই আমাকে এসে বলবে ছুটিতেও দেশে যেতে ইচ্ছে নেই।"

টম ছাড়ল না, "কিন্তু আমার এদেশ ভালো লাগছে না সার।"

"দাঁড়াও, তোমাকে আমি স্যাটারডে ক্লাবের মেম্বার করে দেব। সুইমিং ক্লাবে যাও নিশ্চয়ই।"

"যাই মাঝে মাঝে। কিন্তু—"

"কাম, কাম, বি এ ম্যান।"

এমন পার্টিতে যা হয়ে থাকে, আলোচনা অসমাপ্ত রইল। দু'জনে ছিটকে পড়ল হলের দুই প্রান্তে। তারপর যার সঙ্গেই দেখা হয় একই কথা।

"উঃ কী ভীষণ গরম, তাই না?"

অবশ্যম্ভাবী উত্তর, "হ্যাঁ, কিন্তু হীট নয়, এই হিউমিডিটাই অসহ্য।" কথাটা শুনতে শুনতে টমের কান ক্লান্ত হয়ে গেছে।

মিসেস স্মিথ বলে এক স্থূলাঙ্গীনী বর্ষীয়সী মহিলা ছোট মেয়ের মতো হাসতে হাসতে তাঁর কোনো পরিচিতের কানে কানে বলছিলেন, "জানো, জন কোম্পানির বিল্ সেদিন কী কাণ্ড করেছে?

"টেল মি, প্লীজ!"

"ছি ছি, সেদিন একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে গেছে সুইমিং ক্লাবে। আমি তো অবাক!"

"নতুন এসেছে বুঝি এদেশে?"

"হবে। তবে ছাড়া পাবে না। আমি বলে দিয়েছি ওর বড়ো সাহেবকে।"

"ভেরি রাইটলি টু।"

টম হলের আরেক দিকে চলে গেল এই রকমের গসিপ এড়াতে। বৃথা যাওয়া, বৃথা আশা।

"আই সে, জর্জকে দেখেছে কেউ সম্প্রতি? জর্জ ম্যাকনীল?

"না তো!"

"আমি অবশ্য বাজে গুজবে কান দিইনে, কিন্তু কে যেন সেদিন বলছিল, জর্জকে নাকি ঘন ঘন ফ্রী স্কুল স্ট্রীট অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে।" তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ কাশি। প্রতিবেশিনীর মূর্ছার অভিনয়। টম এ-রাস্তার নামও শোনেনি। এই রসিকতার অর্থ বুঝেছিল সে অনেক দিন পরে।

আরো একমাস কেটে গেল অফিসের কাজের আর সন্ধ্যার নিঃসঙ্গতায়। অবাঞ্ছিত অবস্থান মনের মধ্যে জমিয়ে তুলল অভিমান, যেমন নিজের উপর তেমনি এই দেশটার উপর।

নিরুপায় হয়ে টম আবার বড়ো সাহেবের কাছে হাজির হোলো।

"গুড মর্নিং, সার।"

"গুড মর্নিং, টম।"

"আমি সত্যি আর পারছি না। আমি হোমসিক নই। দেশে আমার কেউ নেই বললেই চলে। বাবা যুদ্ধে মারা গেছে, মা বিয়ে করেছে আরেকজনকে। একমাত্র ভাই ক্যানাডায়। আমি আসলে ইণ্ডিয়াসিক।"

"কিছুদিন পরেই মনসুন ভাঙবে। তখন এত খারাপ লাগবে না। নইলে দার্জিলিং যেতে পারো দিন দশেকের জন্য।"

"প্রশ্নটা আবহাওয়ার নয়। গরমে আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে—"

"যেমন হচ্ছে ?"

"সব কিছুতে। এভরিথিং সীমস সো আটারলি আটারলি রট্‌ন্ ইন দিস কানট্রি। সো ডিমরালাইজিং। আমার এসব বলা উচিত নয়। এদেশটার আমি কতটুকুই বা জানি ? কিন্তু এই চার মাসে আমার জানবার কৌতূহল পর্যন্ত জন্মাল না। ওই যে গেটে টুলের উপর বসে বসে দরওয়ানটা ঝিমোচ্ছে, কাউন্টারের পিছনে বসে বাবুরা পান চিবোচ্ছে আর বাঙলায় কী বলছে ওরাই জানে, এ কোন সভ্য দেশে অফিসে সম্ভব ? এই পরিবেশে থেকে আমি কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। আমার ইংরেজ সহকর্মীরাও কি স্বদেশে তেমন ফাঁকি দিতে সাহস করত যেমন এখানে দেয় ? যা বলছিলুম, ডিমরালাইজিং। মরা জানোয়ারের মাংসও রেফ্রিজারেটরে না রাখলে পচে যায়। আমি জীবন্ত, আর ঈশ্বর জানেন এ দেশটা আর যাই হোক রেফ্রিজারেটর নয়। আমি বলছি আপনাকে, আমি পচে যাচ্ছি। আর কিছুদিন এদেশে থাকলে আমি মানুষই থাকব না। ওই বাবুদের মতো কুঁড়ে হয়ে যাব, ওদেরই মতো মিথ্যা কথা বলতে শিখব। তখন না পারব দেশে ফিরে যেতে, না পারব মানুষ হয়ে এখানে থাকতে। আমাকে এই অধঃপতন থেকে আপনি রক্ষা করুন।"

টমের উত্তেজনা সার কেনেথের কাছে একান্তই অতিকৃত, প্রায় অস্বাভাবিক, বলে মনে হোলো। কই, তিনি নিজে তো এদেশে আছেন বাইশ বছর হতে চলল। অসুবিধা কিছু কিছু আছে বৈকি কিন্তু পুরস্কারও কি নেই? এমন কি মন্দ দেশ এই ভারতবর্ষ? বিলেতে কেনেথ উইলিয়ামসকে কে চিনত? এখানে তিনি বড়ো সাহেব। নামের আগে একটা হ্যাণ্ডল্ এবং ব্যাঙ্কে মোটা টাকা নিয়ে দেশে ফিরবেন। তখন তিনি স্বদেশেও পূজিত হবেন। কেরীয়ার গড়বার এমন সুযোগ তাঁর দেশের ছেলেরা আজকাল নিতে চাইছে না কেন? সার কেনেথের মনে সন্দেহ রইলো না, ওয়েলফেয়ার স্টেটের এই ছেলেরা অকর্মণ্য। ফুল এমপ্লয়মেণ্ট এদের মাথা খেয়েছে।

কিন্তু সার কেনেথের মেলা কাজ। টম জনসনের কাঁদুনি শোনবার তাঁর সময় নেই। তিনি কিঞ্চিৎ রূঢ়তার সঙ্গেই বললেন, "আই অ্যাম সরি, টম; তোমার জন্যে কিছু করতে পারি বলে মনে হচ্ছে না।"

"আমি ফিরে যেতে চাই।"

"আর তো বছর আড়াই মাত্র। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

"আমি অতদিন থাকতে চাইনে। আমি এ-চাকরি চাইনে।"

"তোমার কনট্রাক্টটা আরেকবার ভালো করে পড়ে দেখো। ইট উইল বি এ ভেরি একসপেনসিভ বিজনেস টু রিজাইন নাউ। ফিরে যাবার খরচা শুধু নয়, আসবার খরচা এবং অন্যান্য খরচা তোমাকে তাহলে রিফাণ্ড করতে হবে।"

"যদি বলি আমার শরীর ভালো নেই!"

"ডাক্তারকে দিয়ে তা বলানো শক্ত হবে।"

"যদি আমি ভালো করে কাজ না করি?"

"তাহলে খুলনা বা নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়ে দেব। সেখানে আড়াই বছর কাটানোর চেয়ে কলকাতাই কি ভালো নয়?"

"যদি—"

"আমার আর সময় নেই, টম। চেম্বারে একটা মিটিঙে যেতে হবে দশ মিনিট পরে।"

ধন্যবাদ দিয়ে টম আপন ঘরে ফিরে এলো। গত চার মাস সে ভারতে আসার মতো নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিয়েছে। এখন তার নৈরাশ্য সম্পূর্ণ হোলো। আগামী ত্রিশ বত্রিশ মাস তার এই কলকাতায় কাটাতে হবে। প্রতিদিন এই শহরের সহস্র কুশ্রীতা উত্তরোত্তর দুঃসহ হয়ে উঠবে। তবু উপায় নেই। একবার একটা চুক্তিতে সই করেছে বলে জীবনের তিনটে বছর এই কলকাতার কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। যে দেশটাকে শুধু ভালো লাগেনি, তাকে ঘৃণা করতে শুরু করতে হবে! কাজে মন থাকবে না, তাই কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ ঘটবেই। হয়তো শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হবে অকর্মণ্যের অপবাদ নিয়ে। টম হাতে মাথা রেখে ভবিষ্যৎ আড়াইটে বছরের শাস্তির কথা ভাবতে লাগল। দুপুরে যখন অফিসের লাঞ্চরুমে খেতে গেল তখন নিজেকে আরো বেশি একাকী মনে হোলো। ঘরে ফিরে এসেও কোনো কাজ করতে পারল না। দু'চারটে দস্তখত ছাড়া। প্রায় যখন পৌনে পাঁচটা বাজে তখন তার ঘরে এলো মিস ডরিস লোপেজ।

"আপনি যে কাল বলেছিলেন লণ্ডন অফিসের জন্য ওই রিপোর্টটা আপনি আজ ডিকটেট করবেন?"

"একদম মনে ছিল না। বসুন।"

ডরিস বসে রইল। টমের মাথায় কিছু আসছিল না। কাজে মন ছিল না বলেই বোধহয় টম এই প্রথম ডরিসের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল। না, এ তো একটা ডিক্টাফোন আর টাইপ-রাইটারের সমন্বয় মাত্র নয়।

রঙ্ ফ্যাকাশে সাদা নয়, অলিভের মতো। উজ্জ্বল। চোখ দুটো কালো, টানাটানা। চুল ছাঁটা কিছুটা অড্রে হেপবার্নের

মতো। মুখের ছেলেমানুষী ভাবটাও ওই অভিনেত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোশাকের পারিপাট্যে পাশ্চাত্ত্য রুচির পরিচয় আছে, কিন্তু দেহে আছে প্রাচ্য লাবণ্যের কমনীয় ব্যাপ্তি। সত্যি করে কোনো পতুগীজ জলদস্যু এসে ডরিসের পরিবার প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল কিনা, আজ তা বিস্মৃত অতীতে হারিয়ে গেছে। টমের ঐতিহাসিক গবেষণার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু লোপেজ নামটি মনে করে টম ভুলে যাওয়া জলদস্যুর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করল।

ডরিস একটু অস্বস্তি বোধ করছিল টমের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়ে! হাতের ছোট খাতাটা আর পেন্সিলটা নাড়ছিল আস্তে। রঙ-করা লম্বা নখগুলি ওর লম্বা আঙুলগুলির উপর আদৌ হিংস্র মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ কিছু না ভেবে টম বলল, "রিপোর্ট কাল হবে।"

ডরিস উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হোলো। দরজার কাছে গেলে টম বলল, "একটু ঘুরে দাঁড়ান তো।"

অনুরোধ ডরিস রক্ষা করল কিছু না ভেবেই। সে কিছু বলতে পারবার আগেই টম বলল, "য়ু আর লুকিং ভেরি চার্মিং টু-ডে।"

"থ্যাংক য়ু, মিস্টার জনসন।"

"কল মি টম।"

ডরিস অবাক হয়ে গেল। এই সুদর্শন নবাগত যুবক সহজেই অফিসের সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওরা নিজেদের মধ্যে টমকে নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে। সে-আলোচনায় ডরিস সাধারণত যোগ দেয়নি। সে রিয়ালিস্ট। তার বন্ধু ডেভিড ডিসুজা ট্রামওয়েজে কাজ করে। আকাশে হাত বাড়িয়ে সে নিরাশ হবে না। সে জানে সে সুন্দরী হলেও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাই টম যে অফিসের কোনো মেয়েকে কোনো দিন ভালো করে তাকিয়েও দেখেনি, তা আর যারই মনোবেদনার কারণ হোক, ডরিস তা নিয়ে ক্ষোভ করেনি। কিন্তু আজ টমের কী হোলো?

টম বলল, "আজ সন্ধ্যায় আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তবে—"

ডরিসের দেখা করবার কথা ছিল ডেভিডের সঙ্গে। তারপর ওদের ছবি দেখতে যাবার কথা টাইগারে। কিন্তু সে-কথা মনে আসবার আগেই টম বলল, "—তবে আজ আসুন না কোনো একটা চায়ের দোকানে। আমি কোয়ালিটিতে আপনার জন্য অপেক্ষা করব সাড়ে সাতটায়। "প্লীজ, ডোণ্ট সে নো। আমি ভয়ানক একা।"

টমকে সত্যি বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। বিষণ্ণতার কারণ যে ডরিস নয় তা ডরিসের মনে হবার কথা নয়। সে রাজী না হয়ে পারল না।

বাড়ি ফিরেই ডরিস মাকে জিজ্ঞাসা করল তার নতুন ফ্রকটা ধোবা দিয়ে গেছে কিনা।

"আজ তো দেবার কথা নয়।"

"কিন্তু আজই আমার চাই যে।"

মা একটু বিস্মিত হলেন ডরিসের আচরণে। বুড়ীর একমাত্র নির্ভর এই মেয়ে। ১৯৪৬-৪৭-এ যখন ওদের চেনাশোনা অনেকে ভারত ছেড়ে ইংল্যাণ্ড চলে যাচ্ছিল তখন ডরিসের মার ভয়ের অন্ত ছিল না। ও চলে গেলে তাঁর উপায় হবে কী? ডরিস যায়নি এবং ডেভিডের সঙ্গে বন্ধুত্বে তিনি খুশি হয়েছেন এই কথা ভেবে যে তাহলে ডরিস আর বিলেত যাবার কথা ভাববে না, মাকে ছেড়ে যাবে না। আজ আবার নতুন কোনো বিপদের সূচনা হচ্ছে না তো?

"মামি, তুমি রহিমকে বলো না একটু ধোবার কাছে যেতে।"

ডরিস নিজেই রহিমকে ডেকে তার হাতে একটা টাকা দিয়ে সাতটার মধ্যে জামা নিয়ে ফিরতে বলল। তারপর অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে অন্য একজোড়া জুতো পরিষ্কার করতে বসল।

বাথটাবে জল ভর্তি করল। নতুন সাবান বের করল। গুন গুন করে কী একটা ছবির গানের সুর গাইতে লাগল।

"মা, আমি আজ অফিসের টম জনসনের সঙ্গে বেরচ্ছি। ডেভিড এলে বলে দিয়ো ছবিতে আরেকদিন যাওয়া যাবে।"

মা টম জনসনের কথা এর আগে শুনেছিলেন। তবু সব কিছু অত্যন্ত বিস্ময়কর ঠেকল। মা বললেন, "অফিসের কাজ কি?"

"না, অন্তত টম জনসন নিজে তা নিশ্চয়ই মনে করছেন না। তিনি ভাবছেন, অফিসের ফিরিঙ্গী মেয়ে একটা, দোষ কী তাকে নিয়ে একটু খেতে? খরচাও বেশী নেই, কেননা আমাকে নিয়ে তো ফারপোয় বা গ্র্যাণ্ডে যাওয়া যাবে না। বড়ো জোর পার্ক, টেম্পলবার বা আইসাইয়া। কোনো শনিবার বিকেলে হয়তো অলিম্পিয়া। কোনো রবিবার সকালে হয়তো শেরি বা শেহরাজাদ— যদি আগে থেকে জানা যায় যে সার কেনেথ বা উপরের কেউ ওখানে সেদিন যাচ্ছেন না। কিন্তু টম জনসন জানেন না, আমি সে-দলের মেয়ে নই। আমি বাবুদের বরদাস্ত করতে পারিনে বটে, কিন্তু সাহেবদের জন্য আমার সময় অল্প। পায়ে ধরে প্রেম হয় না।"

ডরিসের মার কাছে এর সব কথা স্পষ্ট মনে হোলো না। হয়তো ভয়ও হোলো, টম জনসনের সঙ্গে অবিনীত ব্যবহার করলে চাকরিটা থাকবে কিনা। না থাকলে তাঁর নিজেরই বা কী অবস্থা হবে? তিনি জীবনে অনেক দেখেছেন, শিখেছেন ধৈর্যধারণ। অনেক সময় সব চেয়ে ভালো করণীয় কিছু না করা। সব চেয়ে ভালো বক্তব্য কিছু না বলা।

পরে রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় ডরিস যখন মার হাতে পাঁচটি একশো টাকার নোট এনে দিল তখনও মা কিছু বললেন না। বার্ধক্যের অশান্তি অনেক। শান্তি এই যে অনাবশ্যক চাঞ্চল্য মনকে পীড়িত করে না। মা নোটগুলি বালিশের তলায় রেখে আবার

ঘুমুতে লাগলেন। তিনি জানতেন মন্দ কিছু হচ্ছে না, হলে তা এমন মন্দ, যার উপর তাঁর হাত নেই।

ডরিস মাত্র একুশ থেকে বাইশে পদার্পণ করেছে কি করেনি। সে সারারাত ভাবল, এ কী জুয়া খেলল সে? জিতলে সেটা কেমন জয় হবে? হারলে সে পরাজয় তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

পরদিন সকালে টম যখন অফিসে এলো তখন সাড়ে ন'টাও বাজেনি। কোট খুলবার আগেই শব্দ হোলো টেলিফোনে—ক্রিং ক্রিং······

টম যখন তার বড়ো সাহেবের ঘরে প্রবেশ করল তখন ঘরটাই শুধু ঠাণ্ডা ছিল, তার অধিকারীর মেজাজ নয়। টম যে "সুপ্রভাত" বলেছিল তার উত্তরে সে পেয়েছিল শুধু "প্রভাত।" সার কেনেথ অযথা বাক্যব্যয় না করে সেদিনকার "স্টেটসম্যান" কাগজটা প্রায় ছুঁড়ে দিলেন টমের মুখের উপর। লাল কালিতে দাগ দেয়া জায়গাটায় দেখা গেল।

ENGAGEMENTS

Johnson-Lopez : The engagement is announced between Thomas Wilfrid Johnson, son of the Rev. Peter Jones Johnson of Nottinghamshire and Doris Diana Lopez, daughter of the late Mr. Alfred K. Lopez and Mrs. Lopez, formerly of the Bengal Nagpur Railway, Khargpur, now in Chowringhee Lane, Cal.. The marriage will take place on a date to be annouuced later.

বলা বাহুল্য, টম জনসনের বা ডরিসের অজ্ঞাতে এ-বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। তবু টম এমন একটা মুখের ভাব করল যেন এইমাত্র বজ্রপাত হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা নয়, বিজ্ঞাপনের কারণটা।

সার কেনেথ ঘরের একদিক থেকে আরেকদিকে পায়চারি

করছিলেন। বাগ্‌দত্ত পুরুষের মতো নয়, মাতৃসদনে অপেক্ষমান স্বামীর মতো প্রায়। সিগারেটটা ছাইদানে পিষে তিনি বললেন, "অন্তত একটা ভারতীয় মেয়েও কি জুটল না তোমার?"

"আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, সার।"

"বেশ, বুঝিয়ে বলছি। আমরা প্রথম কনট্রাক্টে বিয়ে করতে কাউকে উৎসাহ দিই না।"

"বুঝেছি, কিন্তু আমি তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি, এটা আমার শেষ কনট্রাক্ট।"

"আই শুড থিংক ইট ইজ! আই অ্যাশিওর য়ু ইট ইজ। কিন্তু তাই বলে একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে?"

"তা ঠিক, আমি নিজেও কখনো ভাবতে পারিনি। অথচ কাল যখন ওর সঙ্গে দেখা হোলো তখন—"

"ও সব রোমান্টিক ননসেন্সের জন্য আমার সময় নেই। তোমার পক্ষে সব চাইতে অনারেবল কাজ এখন হবে কাজ ছেড়ে দেয়া।"

টম এই দরাদরির জন্য প্রস্তুত ছিল। সে বলল, "আমার কনট্রাক্টে আছে যে আমি এখানে পৌঁছোবার এক বছরের মধ্যে বিয়ে করতে পারব না। ডরিস রাজী হয়েছে, সে পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।"

"ডরিস রাজী হয়েছে, অ্যাজ ইফ দ্যাট মেকস দি স্লাইটেস্ট ডিফ্‌রেন্স টু ম্যান অর ব্রীস্ট!"

"প্লীজ, সার—"

"আই অ্যাম সরি। আমি কোনো মহিলা সম্বন্ধে অপমানসূচক কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু এখনই তো সবাই জানবে যে আমার এক ইংরেজ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এক ফিরিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে! শেম!"

"আই অ্যাম সরি, সার। কিন্তু—"

"কিন্তু কিছু নেই আর। তুমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে আমারই বাধ্য হয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।"

টমের হৃদয় এতে ভেঙে পড়ার কথা নয়। সে বলল, "এই কোম্পানি ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে কিন্তু এ ছাড়া যদি অন্য উপায় না থাকে তবে আমি কোম্পানিকে অযথা বিব্রত করতে চাই না নিশ্চয়ই।"

"বিব্রত যা করবার তা ইতিমধ্যেই করা হয়ে গেছে, থ্যাংক য়ু।"

"আমি দুঃখিত।"

"আমার শতাংশ, সহস্রাংশও দুঃখিত যদি তুমি হয়ে থাকো তবে তুমি আমার কথা শুনবে। এ মেয়েটিকে আজই বলো, তুমি ভুল করেছ, তুমি ভালো করে না ভেবে বিয়ের প্রস্তাব করেছ, তার বিজ্ঞাপন দিয়েছ। এই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা এতে অভ্যস্ত। ইংরেজ মেয়েদের মতো ওরা সেন্টিমেণ্টাল নয়। দু'দিন পরে দেখবে, ডরিস ওই চৌরঙ্গী লেনেরই কোনো ছোকরার সঙ্গে কোথাও জিটারবাগ নাচছে। তোমার কথা মনেও নেই।"

"ডরিসের চরিত্র সম্বন্ধে এসব মন্তব্য আমার মনঃপূত না হলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আশা করি।"

"ডরিস কে তাও আমি জানিনে। মহারানী ভিক্টোরিয়া হয়তো তাঁকে মাথায় তুলে রাখতেন। আমি ভাবছি তোমার ভবিষ্যতের কথা। তুমি ওকে ত্যাগ করো। কালই স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দাও যে এনগেজমেণ্ট ভেঙে গেছে।" কণ্ঠে ক্ষমাসুন্দর উদারতার স্বর এনে সার কেনেথ যোগ করলেন, "তাহলে আমি পুরোপুরি ভুলে যাব যে তুমি এই মারাত্মক ভুল করতে বসেছিলে। হেড অফিসকেও কিছু জানাবার দরকার নেই। যদি তাইতে তোমার সুবিধা হয় তাহলে তোমাকে কয়েকদিনের জন্য ছুটিও দিতে পারি। দার্জিলিং ঘুরে এসো, আবার কাজে মন দাও।"

"ছুটি আমিও চাইব ভাবছিলাম। ডরিসকে নিয়ে আমি কয়েকদিনের জন্য শিলং যাব ভাবছি।"

"শিলং? ডরিসকে নিয়ে?" সার কেনেথ প্রায় রাগে ফেটে

পড়লেন। এমনিতেই ভদ্রলোকের ব্লাড প্রেশার বেশি। "তুমি তাহলে তোমার কেরীয়ারের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর?"

"ডরিসকে না পেলে আমি কোনো কাজ উপযুক্তভাবে করতে পারব না।"

"ডোণ্ট ট্রাই দ্যাট ডিউক অব উইণ্ডসর স্টাফ্ অন মি, টম।"

টম কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে নিরুপায়।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। সুয়েজ বন্ধ থাকায় প্যাসেজ পাওয়া শক্ত হোলো তিন মাসের আগে। এই তিন মাস কী হবে? টম আর ডরিস রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সারা বিশ্বকে জানাবে যে, সার কেনেথের ফার্মে এই অনাচার হয়েছে। হতেই পারে না। তিনি টেলিফোন করলেন দু' তিনটে এয়ার লাইনের অফিসে। কোম্পানি জাহাজের ভাড়ার বেশি দেবে না। অন্তত দেবার নিয়ম নেই। সার কেনেথ স্থির করলেন, তিনি হেড অফিসে স্পেশ্যাল কেস করবেন। আসল দোষ তো ওদেরই যে এমন অব্যবস্থিতচিত্ত যুবককে ওরা কলকাতা পাঠিয়েছে। না হলে তিনি নিজে বেশি খরচাটা দিয়ে দেবেন। তবু তাঁর কোম্পানির—ও নিজের—এ কলঙ্ক তিনি সহ্য করবেন না যে, টম জনসন একটা ফিরিঙ্গী মেয়েকে তার ভাবী বধূ বলে সব জায়গায় পরিচয় করিয়ে দেবে। আর জনসনের পরিচয় তো কোম্পানির পরিচয়।

অনেক চেষ্টা করেও সার কেনেথ টমকে তৎক্ষণাৎ স্বদেশে ফিরিয়ে পাঠাবার পথ পেলেন না। (একবার তাঁর এমনও মনে হোলো যে, বৃটেনের পক্ষে মিশর আক্রমণ সত্যি ভুল হয়েছে—অন্তত এই টমের জন্য!) স্থির হোলো, টম জনসন পরদিন থেকে আর অফিসে আসবে না। পাঁচটা এয়ার লাইনে বলা রইল একটা সীট খালি পেলেই সেটা টম জনসনকে দেবে। তার আগের দিনগুলি? সার কেনেথের আশঙ্কার সীমা রইল না।

এবার তিনি ভয় দেখাবার পথ পরিহার করে উপদেষ্টার ভূমিকা

নেবার চেষ্টা করলেন, "শোনো টম, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তোমার কণ্ট্রাক্ট শেষ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি।"

"না, না, পুরো দায়িত্ব আমার। দোষ হলে তাও।"

"তোমার বয়সে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। আমি বুঝি। আমাকে সংরক্ষণশীল ও নীতিবাগীশ বুড়ো বলে ভুল করো না। তোমার স্ত্রীকে তুমি দেশে নিয়ে গেলে খুব বেশি সামাজিক অসুবিধা না হতেও পারে। অন্তত আমি আশা করি হবে না। কিন্তু এখানে তা চলে না। তোমাকে আমি চলে যেতে বলছি শুধু অফিসের কথা ভেবে নয়। তোমার নিজের জন্যও। এখানে পদে পদে তোমাকে অপমান সহ্য করতে হবে এই বিয়ের জন্য। একদিন হয়তো মনে হবে, প্রেমের জন্য এই মূল্য বড়ো বেশি হয়ে গেছে; আর সামাজিক সম্প্রীতি পেতে হলে তোমাকে নীচে নামতে হবে।"

সার কেনেথের এই নতুন ভূমিকায় কৌতুকের পরিমাণ কম ছিল না। কিন্তু টম ভক্তিভরে তাঁর উপদেশামৃত পান করছিল, কেননা, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কেন মিছে তর্ক করা? আবার দম নিয়ে সার কেনেথ বললেন, "আই হ্যাভ এ সারপ্রাইজ ফর য়ু।"

"তাই নাকি?"

"প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের আইন অনুযায়ী কোম্পানির দেয়া অংশ তোমার পাওনা নয়, কিন্তু আমি ট্রাস্টিদের বলব, ওটা তোমাকে দিয়ে দিতে। আর টিকেট এবং তিন মাসের মাইনে।"

"আমি আপনার কাছে সত্যি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

"নট অ্যাট অল, টম, থিংক নাথিং অব ইট। শুধু একটা অনুরোধ করব।"

"নিশ্চয়ই।"

"প্যাসেজ না পাওয়া পর্যন্ত খুব বেশি বেরুবে না, বিশেষ করে

তোমার বাগ্‌দত্তাকে নিয়ে। আমি বলি কি, তোমরা বাইরে কোথাও চলে যাও। এয়ার লাইন থেকে খবর পেলেই আমি তোমায় টেলিফোন করব।"

"এ সম্বন্ধে অবশ্য আমি ডরিসকে জিজ্ঞেস না করে আপনাকে কথা দিতে পারছি না। কিন্তু আপনার কথা নিশ্চয়ই মনে রাখব।"

"ওয়েল। আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। কোম্পানি তোমার প্রতি অন্যায় কিছু করেনি। আমি নিশ্চয় জানি, তুমিও কোম্পানির কোনো ক্ষতি করবে না।"

"নিশ্চয় না।"

তিন মাস নয়, প্রায় সাড়ে তিন মাস লেগে গেল প্যাসেজ পেতে। নানা রঙের এই দিনগুলি টম ও ডরিসের কেটেছে শিলঙে, দার্জিলিঙে, কিছু কলকাতায়। ওরা হেঁটে গিয়েছিল গ্যাংটক। তখন ডরিসের সেবা করেছে টম, পায়ের জন্য গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করেছে নিজে হাতে। পায়ে ব্যথা নিয়েও পরদিন সকালে ডরিস টমের জন্য শুধু কফি করেনি, রুটি ও টোস্ট করে দিয়েছে।

টম পাদ্রীর ছেলে। কিন্তু তার সহজ পরিহাস যে কোনো "পরিস্থিতি" অনায়াসে সহজ করে দিত। অন্তরঙ্গতা বাদেও যে দু'জন এত কাছে আসবে ডরিস তা ভাবতেও পারেনি।

একদিন জলাপাহাড়ে দাঁড়িয়ে টম ডরিসকে বলল, "আমি ওই এভারেস্টের নাম বদলে মাউণ্ট ডরিস রাখলুম।" তার আগে এর নাম এলিজাবেথ রাখবার কথা হয়েছিল। টম ডরিসকে সম্রাজ্ঞী করল।

এই রকমের অতিশয়োক্তিতে ডরিস হাসত, খুশিও হত। ভাবত, সবটা হয়তো পরিহাস নয়। তবু বলত, "তুমি হাসাতেও পারো, টম।"

"ইংরেজ জাতটাকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে তার সেন্‌স অব হিউমর। আর কী আছে আজ ইংল্যাণ্ডের? কিচ্ছু না।"

কলকাতায় ফিরে এসে টম অফিসের চামারিতে উঠল না। তার আগেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল জায়গাটা। উঠল একটা হোটেলে। ডরিস দীর্ঘ ছুটি নিয়েছিল। সারাদিন থাকত টমের হোটেলে। টেলিফোন যখন বেজে উঠল তখন ডরিস টমের পাশে বসে।

"হ্যালো।"

"স্পীক হিয়ার টু সার কেনেথ, প্লীজ।"

টম সোজা হয়ে বসল।

"টম, এইমাত্র আমাদের ট্রাভেল এজেণ্ট টেলিফোন করেছিল। কাল রাত এগারোটায় একটা ফ্লাইট আছে। কলকাতার একটা বুকিং কে ক্যানসেল করেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে যে, আমরা ওটা নিতে রাজী। তোমার নিশ্চয়ই সব কিছু প্রস্তুত ?"

"কালই ?"

"আই অ্যাম এফ্রেড সো। আমি তাহলে ওদের বলে দিচ্ছি। তুমি আজই বিকেলে গিয়ে টিকেট নিয়ে আসবে ওদের অফিস থেকে। ওয়েল, গুড লাক অ্যাণ্ড গুড বাই।"

"গুড বাই, সার।"

ডরিস সার কেনেথের কথা শোনেনি। কিন্তু তার জানতে বাকি ছিল না কে টেলিফোন করেছে, কেন এবং সে কী বলেছে। টমের ঘাড়ের উপর থেকে তার অবশ হাতটা যেন আপনি পড়ে গেল। টম তার দিকে তাকিয়েছিল। ডরিসের সাহস ছিল না টমের দিকে তাকাবার।

কেউ কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে টম উঠে জামা-কাপড় পরতে লাগল। ডরিস কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও টম অপরাধীর মতো জবাবদিহি করতে লাগল। প্রথমে তার যেতে হবে একবার "স্টেটসম্যান" অফিসে। তারপর, টিকিট আর নাইটব্যাগ তুলে নিতে হবে ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস থেকে। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়। ডরিস কি অপেক্ষা করবে

টম ফিরে না আসা পর্যন্ত? না কি সে ডরিসকে নামিয়ে দিয়ে যাবে চৌরঙ্গী লেনে?

টমের দিকে না তাকিয়ে ডরিস বলল, "কিন্তু চৌরঙ্গী লেন তো তোমার পথে পড়ে না, টম!"

টমের বুঝতে বাকি ছিল না, ডরিসের দৃশ্যত সামান্য উক্তির তাৎপর্য একাধিক। সে চুপ করে রইল।

ডরিস বলল, "তুমি যাও। আমি এখন উঠতে পারব না।" সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল। টম রাত্রের চোরের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ফিরে এসে টম অনেকবার বলল, এক সঙ্গে বেরুবার জন্য। ফারপোয় বা গ্র্যাণ্ডে। না কি থী হানড্রেডে যাবে একবার শেষবারের মতো? না, ডরিসের মত বদলানো গেল না কিছুতেই। সেই রাত্রে প্রায় বারোটার সময় টম ডরিসকে পৌঁছে দিল চৌরঙ্গী লেনে।

বিদায়ের আগে ডরিস প্রতিশ্রুতি দিল, পরদিন রাত্রে সে দমদম যাবে না। টমের অফিসের তিন চারজন বন্ধু হয়তো যাবে তাকে তুলে দিতে। ডরিস সেখানে বিব্রত বোধ করতে পারে। ডরিসের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে তার কানের একেবারে কাছে এসে টম অতি আন্তরিক কণ্ঠে বলল, "এবং তুমি যেখানে বিব্রত বোধ করতে পারো, এমন সামান্যতম সম্ভাবনাও যেখানে আছে, সেখানে তোমাকে যেতে বলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে।"

ডরিস আবার কথা দিল, দমদম সে যাবে না।

কিন্তু তার পরেও অনেকগুলি অন্তহীন ঘণ্টা যে অবশিষ্ট ছিল। টমের সারাদিন কাটল নানা জায়গায় বিদায় নিতে। এখানে ওখানে দুয়েকটা ক্লাবের বিল শুধতে। ডরিসের রাত কেটেছে নিদ্রাহীন ক্রন্দনে। দিন প্রায় কাটতে চায় না ক্রন্দনহীন ব্যথার ভারে।

সন্ধ্যার দিকে ডেভিড এলো। সে জানত সব ইতিহাস, সব

মানে যতটুকু আর সবাই জানত। কিন্তু ডরিসের মার জন্য মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই মাঝে মাঝে আসত খবর নিতে। ভুলেও কখনো ডরিসের নাম করত না। জানত, ডরিসের মাও মেয়ের খবর অল্পই জানতেন।

ডরিস ডেভিডের সঙ্গে এখন কীভাবে কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। ডেভিডকে সে তো প্রায় ভুলে গেছে। তার স্কুটারটা বাড়ির সামনেই ছিল। হঠাৎ বলল, "তোমার স্কুটার কেমন চলছে?"

"ফাইন, ফাইন, ডরিস। চড়ে দেখবে একবার?"

ডরিস কিছু না বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল স্নানের ঘরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে এসে বলল, "চলো আজ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে দূরে, অনেক দূরে।"

অনুগত ডেভিড হাতে চাঁদ পেল। ওরা যখন গিয়ে দমদম পৌঁছোল তখন রাত দশটার কাছাকাছি। বিমান বন্দরের উপরের আকাশে ম্লান চাঁদ উদাসীন, বিষণ্ণ, ক্লান্ত। ডরিস দূরে থেকে দেখল, টম বারের কাছে তিনজন বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে। টম সত্যি সুদর্শন। কিন্তু ডরিস তাকে দেখা না দিয়ে ডেভিডের হাত ধরে কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। ডেভিড অর্ডার দিল একটা বীয়ারের, একটা শেরির।

বন্ধুপরিবৃত টমের পরিহাসপটুত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বোধ হয় দেখা গিয়েছিল সেদিন রাত্রে দমদমে। সে নিজে না হেসে বন্ধুদের হাসাচ্ছিল আরো বেশি।

একজন জিজ্ঞাসা করছিল, "তারপর লেডি উইলিয়ামস কী বলল?"

"কী আর বলবেন? আশা প্রকাশ করলেন আমার বিবাহিত জীবন যেন সুখের হয়। যদিও কথাটা এমনভাবে বলেছিলেন যেন কারো শ্রাদ্ধবাসরে বক্তৃতা দিচ্ছেন।"

হা-হা-হা।

"হিয়ার ইজ ওয়ান ফর করাচি।"

"বাট টেল আস, টম, ডরিস কবে লণ্ডন যাচ্ছে ?"

"কে ?"

"ডরিসই নাম নয় ? তোমার বাগ্‌দত্তা ?"

"ও ইয়েস, শী ইজ এ ভেরি ফাইন গার্ল, ভেরি ফাইন।"

"হিয়ার'স ওয়ান ফর বেইরুট !"

"যাক, কাল সকালে যখন সবাই জানবে তখন বলেই ফেলি তোমাদের। সার কেনেথ যাতে আমাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন সেই জন্যই এই এন্‌গেজমেণ্টের ঘোষণা।" পকেটে হাত দিয়ে টম একটা কাগজের টুকরো বের করে এক বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, "কালকের কাগজে এটা দেখতে পাবে। প্রথম ঘোষণা বেরিয়েছিল ডরিসের সম্মতি নিয়ে, এটাও তাই বেরুবে। আই মাস্ট সে শী সার্টেনলি কেপ্ট হার পার্ট অব দি ডীল টু দি লাস্ট।"

NOTICE

The engagement is cancelled and the marriage will not take place between Thomas Wilfrid Johnson of Nottinghamshire and Doris Diana Lopez of Chowringhee Lane, Cal.,

হঠাৎ লাউডস্পীকারে ঘোষিত হোলো প্লেনের আসন্ন বিদায়ের কথা। এখনই কাস্টমস ছাড়াতে হবে। তাড়াতাড়ি টম তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেল কাস্টমস ঘরের দিকে। একবার ফিরেও তাকাল না কোনো দিকে, সোজা গিয়ে উঠল প্লেনে।

প্লেন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে ডরিস উঠল। দমদম আর কলকাতার মধ্যে দূরত্ব যে এত বৃহৎ তা সে সেদিন সন্ধ্যায়ও বুঝতে পারেনি, যেমন এখন বুঝল।

পরিক্রমা

বেরুবার আগে সমীর আয়নায় একবার তার মুখটা দেখে নিল। বহুকালের অভ্যাস এটা। কিন্তু আজ মনে হল আরও একটা কিছু দেখা দরকার। কী? সামনে ছিল ছেঁড়া একখানা 'সঞ্চয়িতা'। দু'চার পাতা উলটেই মনে হল, কাজটা নিরর্থক। সারা বছর না পড়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করবার পূর্ব-মুহূর্তে বই দেখার মত। পরীক্ষা? কী একটা অজানা ভয়ে সমীর প্রশ্নটাকে সজোরে শান্ত করল। পরীক্ষার কথাটা বানানোও হতে পারে? সে যে-হলে যাচ্ছে সেখান থেকে ফিরে এসে কে কবে ঠিক কথা বলতে পেরেছে? কারও কথায় বিশ্বাস নেই। 'সঞ্চয়িতা' বন্ধ করে সমীর বেরিয়ে পড়ল।

গেল চৌরঙ্গীতে বাসে করে। জায়গাটা ওর ভাল লাগে এমনিতেও। বিশেষ করে আজ, কেন না, কেন না—কারণের চিন্তাটাকেও সমীর মনের মধ্যে হত্যা করল নৃশংসভাবে। সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ নেই। তবু মনের মধ্যে একটা অজানা অপূর্ণতা যেন রয়েই গেল। সমীর গ্র্যাণ্ড হোটেল আর্কেড দিয়ে চলতে চলতে বাঁ দিকের বইয়ের দোকানগুলি দেখছিল। বই সম্বন্ধে তার উৎসাহ ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু সম্প্রতি সে বই সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারিয়েছে। ওতে সব কথা লেখা আছে, শুধু সেই কথাটি ছাড়া যেটি বাদে সব কথা বাজে কথা। তবু সমীর একটা বইয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল, পুরনো অভ্যাস। এ-বই ও-বই দেখতে দেখতে সমীর থমকে গেল একটা অতি নূতন

উপন্যাসের প্রথম কটি লাইন পড়ে। লেখকের নাম জন ওয়েইন, বয়স নাকি ত্রিশের বেশী নয়। বইয়ের নাম, 'লিভিং ইন দি প্রেজেন্ট'। সমীর তাড়াতাড়ি পড়ে নিজের মনে মনে অনুবাদ করল এই রকম, "যে মুহূর্তে এডগার স্থির করল সে আত্মহত্যা করবে, সেই মুহূর্ত থেকে সে বাঁচতে থাকল বর্তমানে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি, এই বর্তমানে বাঁচা। তার গত উনত্রিশ বছরের জীবনে সব সময় অতীতে থেকেছে একটা অনুতাপাসক্ত গতকাল, সামনে একটা ভয়াবহ আগামীকাল। দুয়ে ষড়যন্ত্র করে সব সময় মাটি করে দিয়েছে তার আজ, তার বর্তমান।

কিন্তু এখন···তার সব শেষ হয়ে গেছে। সে স্থির করে ফেলেছে। এখন আর তার সামনে আগামীকাল নেই। আর ভবিষ্যতের এই শরিককে হারিয়ে অতীতও অর্থহীন! এডগার এখন বর্তমানে বাঁচছে।"

সমীর এখানেই থামতে পারল না। আরও কয়েক পাতা পড়ে জানল, এডগার ঠিক করেছে, পৃথিবী থেকে সে বিদায় নেবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে জীবনকে, পৃথিবীকে, সে একটি উপহার দিয়ে যাবে। কী উপহার? তার সঙ্গে সে এমন একটি লোককে নিয়ে যাবে, যে জীবনের শত্রু, যার অপসারণে পৃথিবী সুখী হবে। সে কে? সমীর আর পড়ল না।

সমীরের শরীর শিহরিত হল এই একান্ত আকস্মিক আবিষ্কারে। তার নিজের অবস্থা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে কী বিস্ময়কর সাদৃশ্য একটা হঠাৎ-দেখা (এবং হয়তো মাঝারি) উপন্যাসের প্রথম কয়েক পাতার! সমীরের মনে হল, সে জীবনের অর্থ এতদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে; হঠাৎ মিলল মৃত্যুর অর্থ। সমীরের মনে হল, তার মনের উপর থেকে বিরাট একটা বোঝা যেন নিমেষে নেমে গেল। মৃত্যুর অর্থ পেয়ে চারিদিকের সবকিছু তার কাছে অর্থময় হয়ে উঠল। পায়ের তলার বাঁধানো পেভ্‌মেণ্টে সমীর

পেল মৃত্তিকার স্পর্শ—মৃদু, প্রায় সস্নেহ। অদ্ভুত আনন্দপূর্ণ অনুভূতি।

কিন্তু সমীর বইয়ের দোকান পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবল, তার সিদ্ধান্তে সে অবিচল থাকবে।

* * *

এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিদের মনে করা স্বাভাবিক যে, সমীর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। আদৌ তা নয়। সে বরং আর সবাইয়ের চেয়ে আস্তে হাঁটছিল। তাড়া কিসের তার? আমাদের সবাইকে অতীত জোরে ঠেলা দিচ্ছে পিছন থেকে, ভবিষ্যত টানছে প্রাণপণে। তাই তো বর্তমানটা এমন তাড়ায় ভরা। সমীর দাঁড়িয়ে আছে গতকাল আর আগামীকালের মাঝখানে এক নো-ম্যান'স ল্যাণ্ডে। তার তাড়া নেই। সমীর কোথাও থেকে আসছে না, সে কোথাও যাচ্ছে না। সে এসে দাঁড়াল সাডার ষ্টীটের মোড়ে। সামনেই ম্যুজিয়ম। দরজা বন্ধ। সমীর হাসল তৃপ্তির সঙ্গে। সে জানে তার জন্য ও-দরজা খোলা। খোলা বলেই খুলতে তাড়া নেই, বন্ধ থাকলেও নিজেকে মনে হল না প্রত্যাখ্যাত।

আর কারো কাছে দণ্ডায়মান সমীরকে মনে হল একান্তই গ্রহণীয়। সে সমীরকে অনেক কিছুই দিতে চাইল। "স্বর্গের সুখ"। অনেক কাউকে। সেবিকা, শিক্ষয়িত্রী—জাতীয়া, বিজাতীয়া। অন্য কোনদিন হলে সমীর ক্রুদ্ধ হত। নিজের উপর, তার আকৃতি কি ওই প্রাচীন ব্যবসায়ের প্রতি সুস্পষ্ট নিমন্ত্রণ? পৃথিবীর উপর কেন এসব ব্যবস্থা আজও আছে? আজ সমীরের সহিষ্ণুতার সীমা রইল না। প্রায় অনুকম্পা হল তার পাশে দাঁড়ানো ওই গুঞ্জনকারী গাড়িওয়ালার জন্য। আহা, বেচারী জানে না, ও কী করছে! আহা, বেচারীকে কালও বাঁচতে হবে যে! ও তো মুক্ত নয় আমার মত ভবিষ্যতের দাসত্ব থেকে! সমীর ওকে চার আনা পয়সা দিয়ে এগিয়ে গেল!

ম্যুজিয়ম ছাড়িয়ে সমীর চলল দক্ষিণে। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে দেখল, একটি স্পষ্টতই ধনী ইংরেজ দম্পতিকে। দুজনের সামনে একটা পেরাম্বুলেটর; মধ্যে একটি শিশু, ঘুমন্ত। পিছনে পিছনে চলেছে একটা নাছোড়বান্দা ভিখারী।

দে না সাব্, কুছ খায়া নেই!

সাহেব দৃশ্যতই নবাগত। বললেন, নে মাংটা—যেন ভিখারী কিছু দিতে চাইছিল তাকে। আর একবার বিরক্ত করাতে সাহেব আরও জোরে ধমক দিয়ে উঠলেন। এক মিনিটের জন্য সমীর রাগ করল সাহেবের উপর; এত আছে, কী ক্ষতি হয় দুটো পয়সা দিলে? ভিখারীটার উপকার হয়।

সাডার ষ্ট্রীটের গাড়িওয়ালা সমীরকে সম্ভাব্য গ্রাহক বলে মনে করেছিল। একবার কষ্ট হল, পার্ক ষ্ট্রীটের ভিখারী তাকে আবেদন না জানিয়ে গেছে নির্দয় বিদেশীর কাছে। কিন্তু সমীর এখন সবাইকে ক্ষমা করতে পারে। ভিখারীকেও করল। না চাইতেই তাকে এক আনা দান করল। সাহেবকেও ক্ষমা করল। বেচারীর সঙ্গে ভিখারীর প্রভেদ নিতান্তই সামান্য। ওদের দুজনেরই আগামীকাল আছে। আজ তাই ভিক্ষার দিন বা সঞ্চয়ের ও সতর্কতার দিন। ভিখারী কি করে তার আত্মসম্মান আজ অক্ষুণ্ণ রাখবে? মহাজন আগামীকালের কাছে ওদের আজ বাঁধা। পরশুর কাছে আগামীকাল। উদার হতে পারে একমাত্র সমীরচন্দ্র সরকার। কালের শিকল সে চূর্ণ করেছে সাহসের সঙ্গে। তার সঙ্গে তুলনা কার? জীবনের প্রান্তে আসার আগে অবধি সমীর সুখের স্বাদ পায়নি কখনো।

অথচ কত সহজ কাজটা! আর কিছুক্ষণ পরেই সমীর পৌঁছে যাবে টালিগঞ্জে যেখানে তার বিদায়ের সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে তার আগমনের প্রতীক্ষা করছে। সমীর ইচ্ছা করলেই একটা ট্যাক্সি নিতে পারত। তার মত পয়সা ছিল তার কাছে, এবং তার

সঞ্চয়ের বা কার্পণ্যের প্রয়োজন নেই। কারো কাছে তার ধার নেই। কারো কাছে কিছু পাওনা নেই। সমীর মুক্ত। তবু সে ট্যাক্সি নিল না। হাঁটতে তার ভাল লাগছিল। সে ভাবছিল, সে হাওয়ার উপর হাঁটছে। ট্যাক্সিতে তার কী প্রয়োজন ?

ডানদিকের বিস্তীর্ণ ময়দানের দিকে তাকিয়ে সমীর ওই রকমই বিরাট ও পরিব্যাপ্ত শান্তি অনুভব করল। সে মৃত্যুর সঙ্গে এখন তার সন্ধি করেছে, তাই জীবনের কোনো কিছুই আর তাকে আঘাত করতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, এখন তার যে পৃথিবীটাকে ভাল লাগছে তার মধ্যে লেশমাত্র আসক্তি নেই। আসক্তি কেন, অন্য কোনো অনুভূতির মিশ্রণ নেই তার বর্তমান শান্তিতে। সমীরের মনে পড়ল একটু আগে দেখে আসা উপন্যাসটার কথা। তার নায়ক এডগার কি করে তার আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের পরে অপর একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা, অর্থাৎ একজনকে হত্যা করবার কথা ভাবতে পারলে ? অমন ঘৃণ্য চিন্তা এমন শান্ত মনে আশ্রয় পেল কি করে ? কিন্তু ঔপন্যাসিকের প্রতিও সমীর ক্ষমাশীল। ভাবল, আহা, বেচারীকে গল্প বানাতে হয়। আত্মহত্যার সিদ্ধান্তটা পর্যন্ত লেখক কল্পনা করতে পারে, তার পরবর্তী মনোভাব কল্পনার অতীত। সে শুধু প্রত্যক্ষভাবেই জানা যায়, যেমন সমীর এখন জানছে। দু-চারজন এমন লোক ছিল যাদের প্রতি সমীরের খুশি থাকবার কথা নয়। ওই যে সম্পাদক তার লেখা ছাপেনি। ওই যে বাড়িওয়ালা তাকে অপমান করেছিল কয়েক বছর আগে। ওই যে মেসের ম্যানেজার তার অসুবিধার কথা জেনেও অন্যায়ভাবে দাবি করেছিল তিন মাসের অগ্রিম দাম। কিন্তু এলগিন রোডের মোড়ে পৌঁছানো সমীর তাদের সবাইকে বিনা দ্বিধায় ক্ষমা করল। একবার ভাবল, টেলিফোন করে তাদের জানিয়ে দেয় কথাটা। সামনেই ছিল একটা দোকানে টেলিফোন।

অনুমতি নিয়ে ডাকল সম্পাদককে।

হ্যালো, আমি সমীর সরকার। সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলছি কি?

হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? একটু তাড়াতাড়ি বলুন, আমার হাতে সময় কম।

সময়ের কথা শুনে সমীর হাসল, বলল, সময় আমার আরো কম। টেলিফোন করছি শুধু আপনাকে জানাতে যে, আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি।

ক্ষমা করেছেন? ঠিক শুনতে পারছি না।

ঠিকই শুনেছেন। আমি আপনাকে আমার লেখা না ছাপবার জন্যে ক্ষমা করেছি। কিন্তু যাক সে কথা। কাল সকালে একটা খবর পাঠাব, সেটা নিশ্চয় ছাপবেন যেন।

কি বলছেন যা নয় তা? আমার সময় নেই।

ব্যস্ত সম্পাদক মশাই টেলিফোন রেখে দিলেন। সমীর এতটুকু আহত হল না। শুধু মনে মনে বলল, ছাপবে না আবার! বাংলা দৈনিক আত্মহত্যার সংবাদ ছাপবে না তো ছাপবে কী! দেড় কলম সম্পাদকীয় লিখবে কী নিয়ে? সমীর হো-হো করে হাসতে হাসতে দোকানীকে টেলিফোন কলের জন্য পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এল। আহ্, জীবন কী আরামের, শুধু যদি জান জীবনকে কলা দেখাতে!

রাত তখন কটা? অভ্যাসের বশে সমীরের একবার লোভ হল নিজের কব্জিটা উলটে সময় দেখে নিতে। কথাটা মনে হওয়া মাত্র সমীর সেটা দমন করল। বাজুক না ঘড়ির যত খুশি! সমীর অল্পই পরোয়া করে। সময়ের কথা তার ভাবতে তো হয় শুধু অফিসের দায়ে। অফিসের কথা মনে হতেই দ্বিতীয় এক দুষ্ট বুদ্ধি চাপল সমীরের মাথায়। জন সাহেবকে এক টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া যাক না যে, সমীর তাকেও ক্ষমা করেছে। হোয়াই নট?—জন সাহেব যেমন বলে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

হ্যালো, গুড ঈভনিং।

কে?

সরকার। সমীর সরকার, তোমার ফ্রেইট ডিপার্টমেণ্টের জুনিয়র কেরাণী।

বেশ। কিন্তু এই অপার্থিব ঘণ্টায়? কী হয়েছে?

কিছু হয় নি, টেলিফোন করছিলুম শুধু তোমায় জানাতে যে, তোমাকে ক্ষমা করেছি।

আমাকে ক্ষমা? কী জন্য? হোয়াট অন আর্থ আর য়ু টকিং অ্যাবাউট?

অন আর্থ নয় সাহেব, অন আর্থ নয়। তার বাইরে যাবার পথে।

য়ু মাস্ট বি ম্যাড!

এর চাইতে সুস্থ কখনো বোধ করিনি।

য়ু মাস্ট বি ড্রাঙ্ক!

আহ্, মন্দ বলনি। থ্যাঙ্ক য়ু ফর দি সাজেসশন, সার্।

সার্ মাই ফুট। গুড নাইট অ্যাণ্ড গুড বাই।

সাহেব কি যেন গালাগালি দিচ্ছিল। সমীর তার আগেই টেলিফোন রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে, সর্বশেষ অসৌজন্যের জন্যও সাহেবকে ক্ষমা করল। মনে মনে আবৃত্তি করল আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত, তুমি মোরে করেছ সম্রাট—রবীন্দ্রনাথের কবিতার কেরাণীকে প্রেম যেমন করেছিল। প্রেমের কথায় সমীরের রচনা রায়ের কথা মনে পড়ল না, যেমন হত কয়েক ঘণ্টা আগেও। মনে হল, অন্তত সেই মুহূর্তে, চৈতন্যের কথা—যিনি সবাইকে প্রেম বিতরণ করেছিলেন, যারা কলসীর কানা মেরেছিল, সেই জগাই মাধাইকেও।

সমীর ভাবতে লাগল, আর কে কে তাকে কলসীর কানা

মেরেছে, এডগার যেমন ভাবতে বসেছিল তার সহস্র ঘৃণিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাকে সে খুন করবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে। এবার মনে পড়ল রচনা রায়ের কথা। সত্য বলতে কি, সমীরের আত্মহত্যার সিদ্ধান্তে এই মহিলার দান অল্প ছিল না। তিনি একদা সমীরকে ভালবাসতেন বলে মনে করেছিলেন, এবং সমীরকে জানিয়েছিলেন সে কথা। পরে মন পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু সমীরকে জানাননি কথাটা। আহা, বেচারী আঘাত পাবে! সমীরকে তাই দিনের পর দিন অবর্ণনীয় ঈর্ষা ও যন্ত্রণার সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ওই মর্মান্তিক সত্যটা আবিষ্কার করতে হয়েছিল। দীর্ঘ দেড় বৎসরের সেই অসহনীয় দুঃখের (অনির্বচনীয় আনন্দের কাঁটা মেশানো) প্রতিটি খুঁটিনাটি সমীরের মনে ছিল।

কিন্তু এখন সমীর রচনাকেও যেন ক্ষমা করতে পারে। সে আরো কিছুটা পথ হাঁটতে হাঁটতে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল সিগারেট ধরাতে। দেখল, দোকানে লেখা আছে—আজ নগদ কাল বাকি। এই বিখ্যাত বাণীটি চিরকালই সমীরের কাছে হাস্যকর মনে হত। কিন্তু আজ এই প্রথম সে এই গ্রাম্য চাতুরীর পূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করল। কিন্তু ওই উপলব্ধিও তাকে বেদনা দিল না। তার কাল নেই। আজকের অল্পই বাকি আছে। নগদ সে সবাইকে দিয়েছে, কালকের জন্য বাকির প্রতিশ্রুতি আন্তরিক হলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

রচনাকে যে সে ক্ষমা করেছে—এই কথাটাও তাকে জানানো উচিত নয় কি ? এবার সমীর একটু ত্বরার প্রয়োজন অনুভব করল। তাছাড়া হাঁটতেও আর ভাল লাগছিল না। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা খালি ট্যাক্সি, বাচ্চা। সমীর সেটাকে নিল না। ক্ষুদ্র কোনো কিছুতে আর তার রুচি নেই। কিছুক্ষণ পরেই এল একটা বড় ট্যাক্সি। সমীর সেটাতে উঠল।

সোজা গিয়ে বাঁ দিকে। 'যেতে লাগবে মিনিট নয়েক। পথে

লাল আলোর বাধা পেলে এগারো মিনিট। বিদায়-দেওয়া জীবন আর অনাগত নিঃসময়ের মধ্যে দু'মিনিট এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু ট্যাক্সি-ড্রাইভারের বোধ হয় তাড়া ছিল, সে চলছিল যেমন সে সর্বদা চলে, ফায়ার ব্রিগেডের মত। সমীর বলল, ইতনা জলদি কেয়া সর্দারজী? যো আগে যানা মাংতা, খয়র উসকো যানে দীজিয়ে।

একেই বলে দার্শনিক নির্লিপ্ততা। কিন্তু সর্দারজী ভাবলেন, বাঙালী বাবু ভয় পেয়েছেন। বললেন, ডরনেকা কুছ হ্যায় নেই বাবুজী। হামারা ভি জান হ্যায়।

হায় রে! সমীর কী করে বোঝাবে ওই সর্দারজীকে যে পৃথিবীতে ওই মুহূর্তে সমীর সরকারই একমাত্র ব্যক্তি ছিল, যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে, কোন অভিযোগ না নিয়ে। বস্তুত সবাইকে ক্ষমা করে। সর্দারজী সমীরকে যে মিশনে নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম প্রায় হতে পারত মিশন অব মার্সি। সমীর চলেছে রচনাকে ক্ষমা করতে। আঃ, কী শান্তি ক্ষমায়!

* * *

রচনার প্রসাধন তখন অর্ধসমাপ্ত। সমীর ঘরে ঢুকতেই বলল, আরে, এতদিন পরে সমীর যে!

সেই সন্ধ্যায় এই প্রথম সমীর একটু অনিশ্চিত বোধ করল। সম্পাদক বা সাহেবের সঙ্গে সমীর কথা বলেছিল যেন ওরা কেউই নয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমীর পারল না রচনার সঙ্গে তেমন স্বাভাবিক হতে। একটু থেমে বলল, এই এলুম।

বেশ করেছ। বস।

রচনা কথাটা বলল বটে, কিন্তু সমীরের বুঝতে বাকি রইল না যে রচনা বেরুবার উদ্যোগ করছিল। লুকিয়ে রচনা একবার ঘড়িটা দেখল, কিন্তু তা সমীরের দৃষ্টি এড়াল না। সমীর এবার হাসল। আবার তার কাছে স্পষ্ট হল তার ও রচনার বিপুল প্রভেদ।

একজন এ জগতের অধিবাসী। আর একজন এজগতের বাইরে পা বাড়িয়েই আছে, দ্বিতীয় পা তুলতে বাকি নেই বেশী। সমীর স্থির করল, সে তাড়াতাড়ি তার কথা সেরে বিদায় নেবে। হঠাৎ বলল, রচনা, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। সেই কথাটাই জানাতে এসেছি। এবার আমি উঠব।

রচনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ বসে পড়ল সামনের হাতলহীন চেয়ারটায়। চিরুনিটা আঙুল দিয়ে বাজাতে লাগল, যেন ওটা সেতার বা হার্প। পুরু পাউডারের বাঁধ ভেঙে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটো তাকিয়ে রইল সমীরের দিকে। সেই চোখ! রচনা জানত, ক্ষমা হচ্ছে সর্বশেষ অনুভূতির ঠিক আগেরটা, লাস্ট বাট্ ওয়ান। মানুষ ক্ষমা করতে পারে একমাত্র তাকেই যার সম্বন্ধে তার সর্ব অনুভূতি সমাধি লাভ করেছে। তা নইলে ব্যর্থ, ক্রুদ্ধ ভালবাসা থাকবে। কিংবা থাকবে উল্টে-যাওয়া ভালবাসা, অর্থাৎ ঘৃণা। কিন্তু সমীর রচনাকে ক্ষমা করেছে মানেই রচনা সম্বন্ধে সমীরের আর কোনো তীব্র অনুভূতি নেই। এর পরেই পরিপূর্ণ বিস্মৃতি। সমীরের আকাশে রচনা তখন হবে নিবে-যাওয়া তারা। রচনার অশ্রুবিসর্জন তাই অভিনীত নয়, একান্ত আন্তরিক।

সমীর তবু চুপ করে রইল। মনে মনে আওড়াল, আমার সিদ্ধান্তে আমি অবিচল।

রচনা আর একবার ঘড়ি দেখল। চোখ মুছে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলল, সমীর তুমি ক্ষমা করলে কী হবে? আমি নিজেকে ক্ষমা করিনি। একটা কথা দেবে?

কী?

কাল সন্ধ্যায় এসো, সব কথা তোমায় বলব, যা এতদিন শত চেষ্টা করেও বলতে পারিনি।

কাল আমি আসতে পারব না।

কিন্তু আজ যে আমার সময় নেই, সমীর।

আজও আমি কিছু জানতে চাইনি তো।

তোমার দরকারে নয় সমীর, আমারই প্রয়োজনে। না বলা কথার—থাক। কিন্তু ওই যে বললুম, কাল আমি আসতে পারব না।

কথা বলার সময় রচনার প্রসাধন স্থগিত থাকেনি। এখন তা সমাপ্ত। রচনা বলল, চল, একসঙ্গে বেরুনো যাক। আমি ওই মোড়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নেব। বাসে যাবার আর সময় নেই, ন'টা প্রায় বাজে। চল।

আবার অনুরোধ করছি সমীর, প্লীজ, কাল একবার এসো। আমি বাড়ি থাকব।

বলেছি, পারব না। কিন্তু আজ এত তাড়া কিসের?

রচনা সত্যিই প্রায় ছুটছিল। পথেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। রচনা সেটা থামিয়ে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করবার আগে বলল, কাল সত্যি একবার এসো, সমীর। সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব।

সমীর হেসে বলল, কাল! কিন্তু বুঝতে তো চাইনি!

রচনা বলল, আমার আর একদম সময় নেই সমীর, ন'টা বাজতে আর আট মিনিটও বাকি নেই। যেতে হবে সেই লাইট হাউসে। বেচারী দাঁড়িয়ে থাকবে।

বেচারী! কিন্তু কে? সমীর জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

রচনা তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে বলল, কে? তাও কাল বলব সমীর। কাল নিশ্চয়ই এসো।

শেষ কথাগুলি ধাবমান ট্যাক্সির মধ্য থেকে অস্পষ্টভাবে শোনা গেল। কিন্তু সমীর ভাবল, কে? কার সঙ্গে রচনা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে?

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সমীর যে বাস নিল সেটা শ্যামবাজারের। বাসে বসে শুধু ভাবছিল, কে? জানতে তাকে হবেই।

* * *

যতদূর জানা যায়, সমীর কালও অফিসে গেছে।

লেখক

বাংলা-সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথ ঘটকের স্থান নির্ণয় আমার কাজ নয়। সে কাজ সমালোচকের। যে সব দূরদর্শী সমালোচক তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমার অপঠিত নানা বিদেশী এবং আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের সঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তুলনা করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথ বাংলা-কথাসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেছেন এবং বাংলা-উপন্যাসের আগামী বৎসর সুরেন্দ্র-যুগ বলে অভিহিত হবে, তাঁদের মতের প্রতিবাদ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বরং সে মতের সমর্থনেচ্ছু। গত বারো বছরে তিনি তেরোখানা উপন্যাস লিখেছেন এবং তার প্রত্যেকটি আমি ক্রমবর্ধমান অনুরাগ নিয়ে পড়েছি। বছর পাঁচেক আগে যে ছোটগল্পের সঞ্চয়নটি বেরিয়েছিল, সেটিও বাদ দিইনি।

বাংলা দেশের পাঠকদের আনুগত্য সাধারণত অল্প। বিশেষ কোন লেখকের প্রতি লয়্যাল্‌টি, যার গুণে তাঁর প্রত্যেকটি বই বেরুবার মুহূর্তেই কিনে এনে পড়া হয় এবং তা নিয়ে আলোচনা হয় যে, আগেকার বইগুলির চাইতে নতুন বইটি কোন কোন নতুন গুণে উজ্জ্বল—এসব জিনিস বাংলা-সাহিত্যে প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি আমার অনুরাগ সেই রকমের। আর আমার এই অসাধারণ অনুরাগের কারণও এই যে, সুরেন্দ্রনাথ অসাধারণ লেখক, অন্তত আমাদের ভাষায়। তিনি বিশটা নামে একই বই বছর বছর বের করেন না, তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ে

অনবসর অগ্রগমনের স্বাক্ষর, তাঁর নতুন বই সত্যি নতুন, পুরাতনকে পিছে ফেলে নতুন পদক্ষেপ।

এই অবিরাম যাত্রায় অকস্মাৎ ছেদ পড়ল বছর চারেক আগে। তারপর তাঁর পুরনো বইয়ের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে, কিন্তু নতুন বই তিনি আর লেখেননি। বিবেকবান লেখক, তাই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করেননি। লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন।

লেখা যে একেবারেই চিরতরে ছেড়ে দিয়েছেন, সে কথা জানলুম এই সেদিন। আমার প্রকাশকের অফিস তথা দোকানে আমি গিয়েছিলুম, কেন গিয়েছিলুম তা অবান্তর। ওঁরা সুরেন্দ্র নাথেরও প্রকাশক। তিনিও সেখানে গিয়েছিলেন পুরনো বইয়ের রয়্যালটি নিতে। পরিচয় হল।

অমায়িক, মিতভাষী ভদ্রলোক। আধার দেখে মনেও হয় না যে আধেয় এমন অসাধারণ প্রতিভা। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরেছেন, যেন কোন বিলিতী বেনের অফিসের কেরাণী। কণ্ঠ অত্যন্ত সাধারণ। তাঁর লেখার কথা তুললে বিব্রত হন। চেঁচিয়ে দাবি করা তো দূরের কথা, যে বাংলা-সাহিত্যে তিনি প্রথম সারিতে প্রথম, তিনি যেন তাঁর লেখার সামান্যতা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। কপট বিনয় নয় এটা, সে বস্তুর সঙ্গে আমি পরিচিত। একান্ত আন্তরিক।

পরিচয়ের কিছুক্ষণ পরেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু যদি মনে না করেন, আপনি গত চার বছর কিছু লেখেননি কেন? অন্য পাঠকদের কথা জানিনে, আমি নিজে আপনার নতুন বইয়ের প্রতীক্ষা করে আছি সেই 'সহস্র শূন্য' বেরুবার পর থেকে।

যেন কোন গোপনীয় লজ্জাকর ব্যাধির কথা বলেছি, সুরেন্দ্রনাথ আমার প্রশ্নে এমন লজ্জিত হলেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের পূর্বে শুধু বললেন, অমনি। তা আমি, আমি—

তারপর টেবিল উল্টে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কই, আপনিও

তো অনেক দিন নতুন কোন বই লেখেননি। ভদ্রতার খাতিরে নয়, সত্যি, আপনার লেখা আমার খুব ভাল লাগে।

আমি হেসে বললুম, আপনার প্রশ্নের উত্তর, আপনি শুধু সুলেখক নন, সুসাহিত্যরসিকও।—সুরেন্দ্রনাথ ও আমি একসঙ্গে হেসে উঠলুম। পরে যোগ করলুম, আর দ্বিতীয় উত্তর, আপনি ভাল ট্রেড য়ুনিয়নিস্ট্—একই য়ুনিয়নের কমরেডদের নিন্দা করেন না।

আমি আবার হাসলুম, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রায় বিব্রত হয়ে বললেন, না না, সেজন্যে আপনার লেখার প্রশংসা করিনি কিন্তু। সত্যি—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, কিন্তু থাক আমার কথা। আপনি কেন লিখছেন না?

আটটা তখন বেজে গেছে। প্রকাশকের দোকান বন্ধ করার কথা। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথের টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। আবার আমার প্রশ্নের উত্তর এড়াতে তিনি বললেন, এবারে বোধহয় আমাদের উঠতে হবে। ওঁদের যাবার সময় হয়েছে। আপনি কোন দিকে?

আমি তখন দক্ষিণ কলকাতায় থাকতুম। বললুম সে কথা। জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি থাকি পার্ক সার্কাসে, কিন্তু বাড়ি যাবার আগে আমায় একটু ধর্মতলায় যেতে হবে। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি বলে এসেছি। চলুন, আপনার সঙ্গেই বাসে ওঠা যাক।

প্রকাশক মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন রাস্তায় নামলুম, কলেজ স্ট্রীটে তখন লোকারণ্য। পাশাপাশি দুজনের হাঁটা দায়। সুরেন্দ্রনাথ আমার হাত ধরলেন; নিজে যাতে হারিয়ে না যান সেই জন্যে, না, আমাকে হারাবার ভয়ে, তা

বোঝা গেল না। কিন্তু সেই সামান্য হাত ধরবার মুহূর্তে আমি যেন তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লুম। এতক্ষণ লেখা নিয়ে কথা হচ্ছিল, এবার যেন মানুষটির স্পর্শ পেলুম। বাসে পাশাপাশি বসে সুরেন্দ্রনাথকে আরও আপন মনে হল। তাঁরও তেমনি কিছু মনে হয়ে থাকবে। বললেন, এখন বুঝি বাড়ি গিয়ে গল্প লিখতে বসবেন?

আমি হেসে সত্য উত্তর দিলুম, গল্প লেখা তো দূরের কথা। এখনই যে বাড়ি যাব তারও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। আমি সাধারণত দেরি করে ফিরি।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, আমিও তাই করতুম, বছর চারেক আগেও। এখন অফিস থেকে বেরিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি বাড়ি পৌঁছই, নইলে নচিকেতা ঘুমিয়ে পড়ে।

নচিকেতা?

ওঃ! তাইতো, আপনি জানবেন কি করে? ভুলেই গিয়েছিলুম যে মাত্র আধঘণ্টা আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মনে হচ্ছিল—। হ্যাঁ, নচিকেতা আমার ছেলে। ওরই জন্যে—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, জানেন, আপনি এই প্রথম এমন কথা বললেন। বেশির ভাগ লোক আমার সঙ্গে দশ বছরের পরিচয়ের পরেও আমায় প্রায় অপরিচিত জ্ঞান করে। ওদের দোষ দিইনে। ঘনিষ্ঠ হবার ক্ষমতা, অন্তরঙ্গতা আদায় করবার ক্ষমতা আমার আদৌ নেই।

সুরেন্দ্রনাথ বোধহয় আমার কথা শুনতেও পাননি। তিনি তাঁর অসমাপ্ত বাক্য শেষ করে বললেন, নচিকেতারই জন্যে একটা সাইকেল নিতে হবে। কোন প্রতিবেশীর ছেলের দেখেছে, আর সেই থেকে আমায় এক মুহূর্তের বিশ্রাম দেয়নি। আচ্ছা পাগল—

লেখকদের লেখায় এমোশনের এমন অপচয় হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনের জন্য অল্পই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু নচিকেতার উল্লেখমাত্র সুরেন্দ্রনাথ এমন উৎসাহী হয়ে উঠলেন যে, এতক্ষণ যাকে

অতিমাত্রায় মিতভাষী বলে মনে হয়েছিল, এখন তাকে প্রায় বাচাল বলে মনে হল; বিশেষ করে এইজন্যে যে, পিতৃত্বের অনুভূতির সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তাই নতুন মা-হওয়া মেয়েরা যখন সদ্যোজাত শিশুকে 'ভীষণ দুষ্টু' বলে বর্ণনা করে আনন্দে লুটিয়ে পড়েন, আমি তখন সেখান থেকে যত শীঘ্র সম্ভব অন্তর্হিত হই। বাবাদের মুখে সন্তানের প্রশংসায়ও আমি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করিনে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রের চিন্তায় এমন তন্ময় হয়ে রইলেন যে, আমার পক্ষে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অশোভন হত।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, আপনার যদি তাড়া না থাকে, তা হলে আসুন না আমার সঙ্গে সাইকেলের দোকানে।

আমার তাড়া ছিল না। তাই সানন্দে রাজী হলুম। সাইকেলের দোকানে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ টাকা চুকিয়ে দিয়ে ক্যাশ মেমোটা পকেটে রেখে এমন সাদরে ওই তিন-চাকা বস্তুটার উপর হাত বুলোতে লাগলেন যে, মনে হল তিনি নচিকেতাকেই আদর করছেন। ট্রাইসিকলের উপর হাত রেখে বললেন, আচ্ছা, কটা বেজেছে এখন? আমার ঘড়িটা আমি বাড়িতে রেখে এসেছি, তা নইলে সুষমা রোজ ওকে খাওয়াতে দেরী করে ফেলে। অথচ ঘড়িটা আমারও হাতে না থাকলে বড় অসুবিধা হয়।

আমি বললুম, তা প্রায় পৌনে নটা বাজে।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, আহা, বড় দেরী হয়ে গেল। নচিকেতার এখন নিশ্চয়ই মাঝরাত্রি। সাইকেলের জন্যে কেঁদে কেঁদে এতক্ষণে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনি নিজেও যেন প্রায় কেঁদে ফেললেন। সে সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে বললেন, তা হলে এখন বাড়ি ফিরে কি হবে? চলুন, কোথাও বসে একটু গল্প করা যাক। আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক দিনের কৌতূহল।

আসলে সুরেন্দ্রনাথের শ্রোতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর নচিকেতা সম্বন্ধে আমাকে সব কথা শোনানো। আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। প্রথমত, আমি জানতে চাইছিলুম তাঁর সাহিত্যের কথা। দ্বিতীয়ত ভাবছিলুম, এই ট্রাইসিকল নিয়ে কোথায় কোন দোকানে গিয়ে গল্প করতে বসব? লোকে ভাববে কি?

সুরেন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে এক বর্ণও বলতে উৎসাহী ছিলেন না। আর, কোন দোকানে একটা ত্রিচক্র যান নিয়ে প্রবেশ করা যে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক, এমন সম্ভাবনাও তাঁর মনে নিশ্চয়ই স্থান পায়নি। আমি কিছু বলতে পারবার আগেই তিনি সাইকেলটা স্কন্ধে তুলে বললেন, চলুন, ওই ওয়েলিংটনের মোড়ে স্যাঙ্গু ভ্যালিতে। দু বাটি চা নিয়ে আপনার কথা শোনা যাক।

আমায় সত্যি যেতে হল। দোকানের আর সবাই সুরেন্দ্রনাথের সাইকেলের প্রতি নানা রকম দৃষ্টি হানলেন, কিন্তু তাঁদের দিকে আমার বন্ধু একবারও তাকালেন না। যেন ওঁদের তাকানোটাই অশোভন, ওঁর সাইকেল আনাটা বিসদৃশ নয়। আমার এমন ঔদাসীন্য নেই আর সকলের প্রতি, আমি যে-কোন ভিড়ে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, তাই আমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। কিন্তু আমি বিব্রত কি না সেদিকেও সুরেন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দু পেয়ালা চায়ের আদেশ দিয়ে তিনি বললেন, তারপর, আর কি লিখছেন বলুন? আপনার সেই একটা উপন্যাস তো আর কই শেষ করলেন না?

প্রশ্নটা আমাকে করা, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নচিকেতার সাইকেলটার উপর। আমি তবু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললুম, না, সেই অসমাপ্ত উপন্যাসটা বোধহয় আর শেষ করা হবে না। ওটা লিখেছিলুম একটি মাত্র ব্যক্তির তুষ্টির জন্যে, এবং শুনেছি তাঁরই নাকি ওটা ভাল লাগেনি। বরং শুনেছি, তিনি

নাকি এই জন্মেই বিশেষ করে আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। তাঁর বিরূপতা এড়াতে সব কিছু ছাড়তে পারি। একটা উপন্যাস তো কোন ছার! আমি সাহিত্যের চেয়ে জীবনে বেশী—

সুরেন্দ্রনাথ আমার কথা শুনছিলেন না। তাঁর হাত তখনও সাইকেলের উপর। আমি যেন কিছু বলছিলুম না, তিনিও যেন আমার সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে কদাচ কোন প্রশ্ন করেননি, তিনি তাঁর আপন ভাবনায় বিভোর। বললেন, সুষমার বহুত মিনতি সত্ত্বেও সাইকেল তো কিনলুম নচিকেতার অপ্রতিরোধ্য আদেশে। কিন্তু বাড়িটা বড় ছোট, কাছাকাছিও কোন পার্ক নেই, আমার ওই ছোট ঘরে বেচারী সাইকেল চালাবে কোথায়? আচ্ছা, আমায় একটা বাড়ি দিতে পারেন আপনাদের দক্ষিণ কলকাতায় কোথাও? একটা অন্তত বেশ বড় ঘর চাই; একটু খোলা হলে ভাল, কেননা নচিকেতার স্বাস্থ্যটা এখানে ঠিক ভাল থাকছে না। একটা ভাল বাড়ি আমায় পেতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের ওই হ্যাক্‌নিড লাইনগুলি —ধন নয়, মান নয় এট্‌সেটেরা, একটুকু বাসা—আমার নচিকেতার জন্মে। একটু খবর নেবেন, কেমন?

আমি নচিকেতা-প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপনে বিরক্ত হয়েছিলুম, কিন্তু পুত্রস্নেহে প্লাবিত পিতৃহৃদয়ের অমন আন্তরিক প্রকাশকে শ্রদ্ধা না করাও সম্ভব ছিল না। আমি বললুম, আমি তো এসবের খোঁজখবর তেমন রাখিনে, তবে খবর পেলে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব।

প্লীজ। আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ থাকব। নচিকেতা খোলা হাওয়া না পেলে আমার নিজের নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

আমি আবার চেষ্টা করলুম। বললুম, আচ্ছা, বড় উপন্যাসের জন্মে না হয় সময় নেই, কিন্তু গল্প কিছু লিখছেন না কেন? ছোট গল্প?

কি বললেন? গল্প? ওঃ! আপনাকে পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠ গল্পই তো এখনও বলা হয়নি। নচিকেতা সেদিন করেছে কি—

পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠ গল্প আমার মনে নেই। নচিকেতা ছ মাস বয়সে 'বাবা' বলেছিল বা এক বছর বয়সে হাত থেকে ঝুমঝুমি ফেলে দিয়েছিল—এমনি কোন অভাবনীয় প্লট ছিল সেই শ্রেষ্ঠ কাহিনীর। সুরেন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিক এমন সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যবিস্মৃত হয়ে অতি সাধারণ পিতৃত্বে বিভোর হতে পারেন, তাঁকে স্বচক্ষে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না।

সেদিন বিদায় নেবার আগে সুরেন্দ্রনাথ নচিকেতার অন্তত আরও চারটি কল্পনাতীত কীর্তির কথা আমায় জানিয়েছিলেন—যথা, নচিকেতার ক্রন্দনপ্রতিভা, লাল বল হাতে পেয়ে হাসি, নিরবচ্ছিন্ন পা ছোঁড়া, মায়ের কোলে উঠলে খুশি।

পর পর তিন পেয়ালা চা শেষ করে, নচিকেতার সব কথা শুনে, আমি বললুম, এবার ওঠা যাক।

হ্যাঁ, চলুন। আপনি আসবেন একদিন। দেখবেন নচিকেতাকে। আরও কত যে কাণ্ড করে তা বলে শেষ—

আমি আর আরম্ভও করতে দিলুম না। বললুম, কিন্তু লিখছেন না কেন?

লেখা? নচিকেতা লিখবে। এখনই ও—জানেন? বই পেলেই—

এমন কোন শিশুর কথা জানিনে, যে বই পেলে ঠিক নচিকেতারই মত টেনে নেয় না। কিন্তু তার বাবাকে সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করা বৃথা। আমি বললুম, আচ্ছা, যাব একদিন আপনার বাড়ি।

* * *

যাওয়া আর হয়নি। সত্যি বলতে কি, সুরেন্দ্রনাথ আমায় নিরাশ করেছিলেন। এমনিতেই সাধারণত কোথাও আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না। তবু যদি বা চেষ্টা করে সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে যেতে চাইতুম সে শুধু এই জন্যে যে, তিনি প্রতিভাবান লেখক। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই বেদনার সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলুম যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সকল উৎসাহের অবসান হয়ে গেছে। এখন তিনি

লেখক নন, কতকগুলি প্রকাশিত বইয়ের রচয়িতা মাত্র। ভূতপূর্ব লেখক। কী হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে? ব্যক্তি হিসাবে তিনি সুখী, নচিকেতাই সে জন্যে যথেষ্ট; কিন্তু লেখক হিসাবে তিনি মৃত, কেননা তিনি সাহিত্যবিস্মৃত। সাহিত্যের উজানে সংগ্রাম পরিত্যাগ করে তিনি জীবনের জোয়ারে ভাসতে সিদ্ধান্ত করেছেন। কি হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করে?

গত রবিবার হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথের টেলিফোন পেলাম। আমার নম্বর জানলেন কি করে? তা ছাড়া আমাকে তাঁর দরকারই বা কি? লৌকিক কুশলপ্রশ্নের পরে আমি বললুম, বাড়ির কোন খোঁজ পাইনি এখনও। তাই আপনার ওখানে আর যেতে সাহস পাইনি।

আরে, সেইজন্যেই তো আপনাকে টেলিফোন করলুম।

সুরেন্দ্রনাথ সশব্দে হাসছিলেন। সাধারণ মানুষের চিন্তাহীন হাসি, সহজ আনন্দের অকপট প্রকাশ। সাহিত্যিকের চিরন্তন-জিজ্ঞাসালাঞ্ছিত পরিমিত হাসি নয়। আমার বিরক্তি বাড়ল, কেননা অবোধ সুখের সঙ্গে আমার চিরকালের বিরোধ। অপরের বেদনায় আমি ভাগ নিতে পারি, সুখে নয়।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আমার কথা আদৌ ভাবছিলেন না। হাসি স্থগিত রেখে বললেন, লোয়ার সারকুলার রোডে একটা চমৎকার বাড়ি পেয়েছি। হ্যাঁ, ঠিক বড় রাস্তার ওপরে নয়। গোলমাল নেই। ডান দিকের গলিতে। হ্যাঁ, দু শো তিন নম্বর। চলে আসুন। সেদিন আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, আসছেন তা হলে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি রাজী হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, ঝগড়া করব সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। তাঁকে আবার বোঝাব যে, প্রতিভা-বানের অধিকার নেই জীবনোপভোগে। প্রতিভা তো ভগবানের দান নয়, সে ভগবানের ঋণ, যা শোধ দিতে হয় সহস্র গান দিয়ে, লেখা দিয়ে, ছবি দিয়ে।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে পৌঁছে সাহিত্যের কথা উচ্চারণ করতেও আমি সুযোগ পেলুম না। দরজা খুলেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ নিজে। সেই সঙ্গে মুখ। প্রসঙ্গ নচিকেতা।—এই যে আসুন আসুন। নচিকেতা—

ট্রাইসিকলে চড়ে নচিকেতা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, যেমন দাঁড়াত অন্য যে কোন শিশু। কিন্তু আমি দেখছিলুম সুরেন্দ্রনাথকে—এমন অভাবনীয় দৃশ্য যেন তিনি এ জীবনে আর অবলোকন করেননি। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, নচিকেতা, তোমার মাকে বল, তোমার লেখক-কাকা এসেছেন। চা চাই।

নচিকেতা আবার তার সাইকেলে আরোহন করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। সুরেন্দ্রনাথ পুত্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নচিকেতা অদৃশ্য হলে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ, আসুন, আপনাকে এবার বাড়িটা দেখাই। একটু পুরনো বাড়িটা। দরজা-জানালাগুলো সারাতে হবে, কিন্তু কী বড় এই মাঝের হলঘরটা! এইটে শোবার ঘর। সুষমা বলে, এই বড় হলটা পার্টিশন করে একটা বসবার ঘর, একটা খাবার জায়গা, আরও কত কি করতে। আমি রাজী নই। নচিকেতা সেই সাইকেল পাবার পর থেকে ও-বাড়িতে কেবলই বাইরে যেতে চাইত। কিন্তু বাইরে তো যেতে দিতে পারিনে, আয়ার সঙ্গেও না। এ-বাড়িতে এসে ও বাড়ির মধ্যেই যে খোলা জায়গাটুকু পেয়েছে; এক মুহূর্ত বিরাম নেই, সারাদিন এখানে সাইকেলে চড়ছে!

আমি বললুম, হ্যাঁ, সত্যি বেশ বাড়িখানা। চারতলার ওপর, খোলা, বেশ হাওয়া আর আলো।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, উঠতে নামতে একটু কষ্ট, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। নচিকেতা যে এতটা জায়গা পেয়েছে সেইটেই বড় কথা। আসুন, এই হলেই বসা যাক। নচিকেতার ওপরও চোখ রাখা যাবে। চা-ও খাওয়া যাবে।

আমরা ওই বড় ঘরটায় মেঝের উপর বসলুম। আমি কিছুক্ষণ পরে বললুম, সত্যি সুন্দর বাড়ি পেয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ। সাধারণত ছবি-আঁকিয়েদের জন্যে ভাল স্টুডিও থাকে, লেখকদেরও যে লেখবার জন্যে অনুকুল পরিবেশের প্রয়োজন—একটু আলো, একটু রঙ, একটু আকাশ, একটু বাতাস—এ কথা দেখবেন কেউ স্বীকার করে না। ওদের ধারণা, যে কোন গলিতে, যে কোন বস্তিতে বসে লেখক যে কোন জগতের কথা লিখতে পারে।

আমি সুযোগ পেয়েই বললুম, গুড, এবারে তো ভাল বাড়ি পেয়েছেন, এবার তা হলে লেখা শুরু করবেন আবার?

এমন সময় নচিকেতা আবার এল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। ও চিৎকার করছিল, ফায়ার ব্রিগেড, ফায়ার ব্রিগেড, সবাই সরে যাও সামনে থেকে। আগুন! আগুন! সুরেন্দ্রনাথ আবার সাহিত্য প্রসঙ্গ পরিহার করে বললেন, দেখুন দেখুন, সেই কবে কত যুগ আগে ওকে একদিন ফায়ার ব্রিগেডের কথা বলেছিলুম, এখনও ঠিক মনে রয়েছে। কি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি!

আমি আবার বললুম, কিন্তু আবার কি লিখবেন বলুন?

লেখা? সে আর হবে না। দরকারও নেই। দেখুন, দেখুন, নচিকেতা কি জোরে সাইকেল চালায়, সত্যি যেন মোটর সাইকেল। এস তো বাবা।

নচিকেতা কোন কথা না শুনে সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজিয়ে সাইকেল চালাচ্ছিল। ঘরের এ-ধার থেকে ও-ধার, আবার ও-ধার থেকে এ-ধার। ক্লান্তি নেই। জোরে, আরও জোরে। আমি ওই গোলমালে একটু বিরক্ত হচ্ছিলুম, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কানে ওই সাইকেলের কর্কশ ঘণ্টাই যেন সুমধুর সঙ্গীত বর্ষণ করছিল। তবু আমি আবার বললুম, কিন্তু আপনি আর না লিখলে নচিকেতাও বড় হয়ে আপনাকে ক্ষমা করবে না।

ওঃ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে তো এখনও নচিকেতার লেখাই দেখানো হয়নি। মাত্র চার বছর তিন মাস বারো দিন বয়স, কিন্তু—

সুরেন্দ্রনাথ উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে বিরাট এক তাড়া কাগজ বয়ে এনে আমায় দেখাতে দেখাতে বললেন, এই দেখুন, সবে অ আ ক খ লিখতে শিখেছে, আর এরই মধ্যে কত কাগজ ভর্তি করে ফেলেছে। আমি আবার বাজে কাগজে লিখতে পারিনে। তাই যখন মহাকাব্য সংরচনের রুচি ও অভিলাষ ছিল, তখন জার্মান ক্রীমলেড বণ্ড কাগজ অনেক কিনে রেখেছিলুম। বলা তো যায় না, কবে ওরা ইমপোর্ট বন্ধ করে দেবে। এখনও আমার বোধ হয় দিস্তে পঞ্চাশ আছে। সব দিয়ে দিয়েছি নচিকেতাকে। দেখুন কি সুন্দর লেখা। অ আ ক খ। নিজে হাতে ধরে শিখিয়েছি। অ আ ক খ—

সুরেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসের বিরাম ছিল না, যেমন ছিল না নচিকেতার সাইকেল চড়ার। আমি ততক্ষণে বুঝেছিলুম যে লেখার কথা তোলা আর সম্ভব হবে না। ভাবছিলুম কত শীঘ্র ওঠা যায়। নচিকেতা একবার প্রায় আমার গায়ে এসে পড়েছিল, তারপর হাসতে হাসতে আবার সে জোরে সাইকেল চালাল ঘরের অপর প্রান্তে জানালার দিকে। সুরেন্দ্রনাথ আনন্দে উপচে পড়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, জোরে, আরও জোরে, দেখি কি রকম ফায়ার ব্রিগেড তুমি, দেখি!

নচিকেতা আবার 'আগুন' 'আগুন' বলে চিৎকার করে জানালার দিকে চলল। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, সত্যি। আর আমার কিছু চাইবার নেই। সুন্দর বাড়ি পেয়েছি, নচিকেতা এই খোলা জায়গায় সব সময় হাসছে, আর আমি বসে বসে দেখছি। দিস ইজ প্যারাডাইস ইনডিড।

গতির নেশা নচিকেতাকে পেয়ে বসেছিল। ছেলের নেশা

সুরেন্দ্রনাথকে। আমার উপস্থিতির প্রতি উদাসীন হয়ে তিনি ছেলের লেখা অ আ ক খ ইত্যাদির উপর হাত বোলাচ্ছিলেন। ও-ই তাঁর লেখা।

হঠাৎ নচিকেতা ধাক্কা খেল জানালাটার সঙ্গে। জানালাটা সশব্দে ভেঙে গেল। নচিকেতা চারতলা থেকে সাইকেলসহ নীচে পড়ে গেল। গোলমাল। কান্না। ভিড়।

আমি সুরেন্দ্রনাথকে হাত ধরে এনে বসালুম। নচিকেতার লেখা কাগজগুলি তিনি ওই ভাঙা জানালাটা দিয়েই নীচে ফেলে দিলেন। তাঁর দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ ছিল সাদা কাগজের উপর।

চোখে জল, হাতে কলম।